তাইসীরুত তাফসীর

(সূরাহ্ আল-হুজুরাত)

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

তাইসীরুত তাফসীর

(সূরাহ্ আল-হুজুরাত)

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

তাইসীরুত তাফসীর (সূরাহ্ আল-হুজুরাত)
গ্রন্থকারঃ ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন

ISBN : 978-984-8471-01-02

প্রকাশকাল
অগ্রহায়ণ : ১৪১৮
মহর্‌রম : ১৪৩৩
ডিসেম্বর : ২০১১

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাসা # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬
E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com,
Website : www.iiitbd.org

মূল্যঃ ২৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
চৌকস প্রিন্টার্স, ঢাকা

TAYSIRUT TAFSIR (SHURAH AL-HUJURAT) by Dr. Muhammad Belal Hossain and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka- 1230, Phone: 8950227, 8924256, E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com, www.iiitbd.org.* Price: Tk. 250.00.

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বড় মামা
মো. রইস উদ্দীন আহমেদ-এর উদ্দেশ্যে–
যাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় জীবনের
এ অর্জন।

প্রকাশকের কথা

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত জীবন বিধান আল ইসলাম। সত্য সুন্দরে সমুজ্জ্বল ও মুক্তির পয়গাম এ দ্বীন ইসলামকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যুগে যুগে আসমানী কিতাবসহ পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী-রসূল। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) কেও আল্লাহপাক দিয়েছেন জীবন বিধান আল-কুরআন। এটি আরবী ভাষায় উন্নত বাক-রীতি, অপূর্ব সৌন্দর্য ও সৌকর্যে অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই রসূল (সা.) সাহাবীগণকে আল-কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। ফলে তাঁরা রাসূলের প্রত্যেক নির্দেশনায় আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হতেন। এভাবে রাসূল (সা.)-এর যুগেই তাফসীর শাস্ত্র নামক এক উন্নত ও গৌরবান্বিত অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়।

কুরআন গবেষকদের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ পর্যন্ত আল-কুরআনকে ঘিরে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩,৫০০ উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন গবেষণার এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রণীত তাফসীর গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এ ভাষায় হাতে গোনা দু'চারটি মৌলিক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আর বেশ কিছু প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। তাই বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিকট আল-কুরআনের অমোঘ বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পৌঁছে দেয়া আজ সময়ের দাবি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিআইআইটি আল-কুরআনের সূরাহ্ ভিত্তিক তাফসীর *তাইসীরুত তাফসীর* (সূরাহ্ আল-হুজুরাত) প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের তাফসীর প্রণয়ন এক দুরূহ কাজ ও শ্রমসাধ্য বিষয়। এ দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কাজ অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রান্জল ভাষায় সম্পন্ন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন যিনি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করে আসছেন।

আশা করি ড. হোসেন প্রণীত সূরাহ্ আল-হুজুরাত এর তাফসীর দেশের বাংলা ভাষাভাষী কুরআন প্রেমিক মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত আশা পূরণে সক্ষম হবে এবং বিশেষ করে দেশের বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি সহায়ক পুস্তক হিসেবে সাদরে গৃহীত হবে ইনশাল্লাহ।

এই বইটির প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করুন। আমীন॥

এম আব্দুল আজিজ
নির্বাহী পরিচালক, বিআইআইটি

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ذِىْ الْعِظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِزَّةِ وَالْبَقَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالْعَلَاءِ وَالْمَجْدِ وَالثَّنَاء والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحَبِيْبِهِ وَصَفِيِّهِ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامِ الْأَتْقِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَبَعْدُ!

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। এটি আরবী ভাষায় উন্নত বাক-রীতি, অপূর্ব সৌন্দর্য ও সৌকর্যে অবতীর্ণ হয়। এ মহাগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে মানবতার মুক্তির জন্য অনির্বাণ পথ-নির্দেশনা। এতে মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। এতে উৎকলিত বিষয়বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় সুবিন্যস্ত হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, ছন্দের সাবলীল ও গতিময় সম্মোহনে এবং মর্মস্পর্ষী আবেদনে পরিব্যপ্ত।

এ মহাগ্রন্থের রচনাশৈলী তৎকালীন আরবদের রচনাশৈলী থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর। এর ভাষ্য ছন্দবদ্ধ হলেও তা গদ্য বা পদ্যের পরিবৃত্তে বেষ্টিত নয়। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন কুরাইশদের অন্যতম ভাষাবিদ, অলংকার ও কাব্যে শাস্ত্রে পারদর্শী ওয়ালীদ ইবন মুগীরাহ্‌র উক্তি উজ্জল প্রমাণ। তিনি একদা রাসূল (সা.)-এর নিকট আগমন করলেন। রাসূল (সা.) তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। এতে তাঁর মন বিগলিত হলো। কুরআনের সম্মোহনী শক্তি তাকে আকৃষ্ট করল। এ সংবাদ আবূ জাহালের নিকট পৌঁছলে সে দ্রুত ওয়ালীদের কাছে এসে বলল, হে চাচা! শোনা যাচ্ছে যে, আপনি নাকি মুহাম্মাদের নিকট গিয়েছেন এবং তার থেকে উপকৃত হতে চান। এজন্য আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাকে মুহাম্মাদের কবল থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছে এবং এগুলো অর্থ তারা আপনাকে প্রদান করবে। একথা শুনে ওয়ালীদ বললেন, শোনো হে আবূ জাহল! কুরাইশরা জানে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী। সুতরাং তাদের সংগৃহীত অর্থ আমার সম্পদ, প্রতিপত্তি ও বৈভবের কাছে কিছুই নয়। একথা শুনে আবূ জাহল বলল, তাহলে আপনি মুহাম্মাদ সম্পর্কে এমন মন্তব্য করুন যা শুনে আপনার সম্প্রদায় বুঝতে পারবে যে, আপনি তাকে অস্বীকার করেন। এরপর ওয়ালীদ বলতে লাগলেন,

ماذا أقول فوالله مافيكم رجل أعلم بالشعر منى لابرجزه ولا بقصيدته وبأشعار الجن والله ما يشبه هذا الذى يقول شيئا من هذا والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق انه ليعلو وما يعلى عليه.

'আমি কুরআন সম্পর্কে আর কী বলব? আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে কবিতা সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখে না। চাই সে কবিতা রাজায বা কাসীদা হোক অথবা জীনদের কবিতা হোক। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ যা বলছে এর সমতুল্য কোন বাণী হতে পারে না। আল্লাহর কসম! এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে সম্মোহনী শক্তি। এ কথাগুলোর বাহ্যিক আবরণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং এতে নিহিত ভাবোচ্ছাস অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর। এটি বিজয়ী হবে। একে কেউ পরাজিত করতে পারবে না।' একথা শুনে আবূ জাহল বলে উঠল, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তার সম্পর্কে মন্তব্য না করবেন ততোক্ষণ আপনার সম্প্রদায় আপনার উপর অসন্তুষ্ট থাকবে। তখন তিনি বললেন, আমাকে একটু চিন্তা করার অবকাশ দাও। এরপর তিনি বললেন, এতো সুস্পষ্ট যাদু। তোমরা দেখো না, যে এর সংস্পর্শে আসে তাকেই সে তার পরিবার ও বন্ধু বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার এ বক্তব্যের পর আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়,

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ نَظَرَ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

'সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে। সে ধ্বংস হোক, সে কিভাবে মনস্থির করেছে (আবার বলছি), সে ধ্বংস হোক, সে কিভাবে মনস্থির করেছে। দেখেছে, সে আবার ভ্রুকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করেছে। অতঃপর পৃষ্ট প্রদর্শন করেছে এবং অহংকার করে বলেছে, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ আর কিছুই নয়। (সূরাহ আল-মুদ্দাসসির: ১৮-২৪)।

এ হলো ঐ ব্যক্তির বক্তব্য, যে ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করত। রাসূল (সা.)-এর নিকট আগমন করে কুরআন শোনা মাত্রই সে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর যখন স্বীয় বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফিরে আসে তখন সে সম্মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, আল-কুরআনের সম্মোহনী শক্তি কত তীব্র যা যাদুকেও হার মানায়। এমনকি আরবের তৎকালীন বড় বড় ভাষা বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এ মহাগ্রন্থের রচনাশৈলীতে স্তম্ভিত হয়ে এর মায়াজালে আবদ্ধ হন।

উপরিউক্ত ঘটনা ছাড়াও তাফসীরের ইতিহাস গ্রন্থে অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যেগুলো থেকে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয়। আব্দুল কাহির আল-

জুরজানী, আয-যামাখশারী ও আল-বাকিল্লানীসহ মুসলিম উম্মাহর বড় বড় বিদগ্ধ পণ্ডিত আল-কুরআনের ই'জায বা অলৌকিকত্ব প্রমাণে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তাফসীর অভিজ্ঞানকে করেছে সমৃদ্ধ ও উন্নত।

জ্ঞান জগতে তাফসীর শাস্ত্র এক উন্নত ও গৌরবান্বিত অভিজ্ঞানের নাম। উৎকর্ষতা ও মানগত দিক দিয়ে এ অভিজ্ঞান শীর্ষস্থানীয়। সাধারণভাবে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে তাফসীর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ মহাগ্রন্থে বর্ণিত আয়াতসমূহের মর্মোদঘাটন, প্রয়োগিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং এতে নিহিত মৌলিক শিক্ষা ও নির্দেশনাকে মানব মনে অংকিত করে দুর্বোধ্য বিষয়ের সহজচিত্র পাঠকের হৃদয়তন্ত্রিতে প্রতিবিম্বিত করা তাফসীর শাস্ত্রের অন্যতম দিক। এরই ধারাবাহিকতায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই রাসূল (সা.) সাহাবীগণকে আল-কুরআনের নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। ফলে তাঁরা রাসূলের প্রত্যেক নির্দেশনায় আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনে সক্ষম হতেন। এভাবে রাসূল (সা.)-এর যুগেই এ অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবীগণের মধ্যে তাফসীর চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে। তারা ছিলেন এ উম্মতের সর্বোত্তম মুফাসসির। তাঁরা তাঁর বাণী ও 'আমল থেকে তাফসীর সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁদের মধ্যে দশ জন ছিলেন প্রসিদ্ধ মুফাসসির। তাঁরা হলেন, আবূ বকর (রা.), 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা.), 'উছমান ইব্ন 'আফফান (রা.) 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.), উবাই ইব্ন কা'ব (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.), 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ির (রা.) প্রমুখ। এ দশজন ছাড়াও যাঁরা তাফসীর চর্চায় অপেক্ষাকৃত কম প্রসিদ্ধ, তাঁরা হলেন, আবূ হুরায়রা (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.), আনাস ইব্ন মালিক (রা.) জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ। উল্লিখিত সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আব্দিল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, সুক্ষ্ম-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে আল-কুরআনের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় বিশ্লেষণ করতেন। তাফসীর অভিজ্ঞানে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার কারণে তাঁকে এ উম্মতের *মুফাসসির শিরোমনি* হিসেবে অভিহত করা হয়।

সাহাবীগণের পর তাবি'ঈনের মধ্যে তাফসীর বিষয়ে যাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন, 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ্, ইকরামাহ্, সাঈদ ইবন যুরায়র, হাসান আল-বাসরী, আবূল আলিয়া প্রমুখ। তাঁরা আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পেশ করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক পণ্ডিত আল-কুরআনের তাফসীর রচনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। কুরআন গবেষকদের প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এ পর্যন্ত আল-কুরআনকে ঘিরে বিভিন্ন ভাষায়, প্রায় ৩,৫০০ উল্লেখযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন গবেষণার এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তাই সত্যিকার মুফাসসির তারাই, যাঁরা কুরআনের তাফসীরে মহানবী (সা.), সাহাবী (র.) ও তাবি'ঈদেরকে (রহ.) অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন এবং করবেন। আল-কুরআন যে মহান শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, কুরআনের সে উন্নত শিক্ষাকে বিশ্বমানবতার সামনে সুস্পষ্ট ও পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই একজন বিজ্ঞ মুফাসসিরের কাজ।

একজন বিজ্ঞ মুফাসসিরের জন্য কতিপয় বিষয়ে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এসব বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে কোন মুফাসসিরের পক্ষেই আল-কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব না। নিম্নে উক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. মুফাসসিরকে অবশ্যই আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শব্দের ব্যবহার রীতি সম্পর্কে বোদ্ধা হতে হবে। কারণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও উন্নত বাক-রীতিতে অবতীর্ণ হয়। এর ভাষা ও অলংকার উঁচুমানের। এজন্য আরবী ভাষার বিশুদ্ধ রূপ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে একজন মুফাসসিরের জন্য তাফসীর করা সম্ভব নয়। মুজাহিদ বলেন, যিনি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন, কুরআনের ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যতীত কুরআন সম্পর্কে কোন কথা বলা তার জন্য বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে আরবী ভাষা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা থাকতে হবে।

২. আরবী বাক্য প্রকরণ তথা *'ইলমুন নাহু* সম্পর্কে মুফাসসিরের অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা 'ইরাবের বিভিন্নতার কারণে শব্দের অর্থও বিভিন্নরূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে সর্বনাম, *নাকিরাহ্, মা'রিফাহ্, মারফু'আত, মানছূবাত, মাজরুরাত* ও *'আওয়ামিলে হুরুফ* সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর জ্ঞান লাভ ছাড়া আরবী ভাষা যেমন, আয়ত্ব করা যায় না তদ্রুপ এ ভাষার সঠিক অর্থ ও মর্ম উদঘাটন করা অত্যন্ত কঠিন। তাই *'ইলমুন নাহু* সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়।

৩. আরবী শব্দ প্রকরণ তথা *'ইলমুস সরফ* সম্পর্কেও মুফাসসিরকে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। শব্দ গঠন ও শব্দের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ না হলে অর্থের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। শব্দের গঠন প্রণালী, রূপান্তরিত রূপ, একবচন, বহুবচন, ইসম, ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারভেদ ও প্রকরণ সম্পর্কে মুফাসসির অভিজ্ঞ না হলে বাক্যে সঠিক অর্থ উদঘাটনে তিনি সক্ষম হবেন না। এজন্য তাকে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হবে।

৪. হাদীস সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে। কেননা মহানবীর (সা.) হাদীছ হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই হাদীছের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা মুফাসসিরের জন্য অত্যাবশ্যক। মহানবীর (সা.) বাণীতে আয়াতের তাফসীর খুঁজে না পাওয়া গেলে সাহাবীগণের বাণীর শরণাপন্ন হতে হবে। কেননা সাহাবীগণ ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরা সর্বোপরি কুরআন নাযিল হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। কোন্ আয়াত কখন, কীভাবে নাযিল হয়েছে সবই তাঁরা জানতেন। তাই তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

৫. *'উসূলুদ দ্বীন* সম্পর্কে মুফাসসিরকে অভিজ্ঞ হতে হবে। *'ইলমুল 'আকীদাহ্* বা *'ইলমুল কালাম* সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা দুরুহ ব্যাপার। কেননা আল-কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য উসূলীগণ এ সমস্ত আয়াতের তা'বীল করে থাকেন এবং তাঁরা আয়াতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে কোন প্রকার মতানৈক্য ও জটিলতার সৃষ্টি না হয়।

৬. *'ইলমুল কিরাআত* সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা কিরাআতের বিভিন্নতার কারণে অর্থের মধ্যে যে তারতম্যের সৃষ্টি হয়, তা কিরাআত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব নয়। এছাড়া মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সাত পঠন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ পঠন রীতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে কুরআনের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

৭. আল্লাহর যাত, সিফাত, হুকুম ও ইখতিয়ারাত সম্পর্কে মুফাসসিরকে সঠিক ধারণার অধিকারী হতে হবে। এছাড়া মহানবীর (সা.) রিসালাতের দায়িত্ব ও মর্যাদা এবং তাঁর গোটা সীরাহ্ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে হবে।

৮. আল-কুরআন যে সমাজে অবতীর্ণ হয়েছিল। সে সমাজের সার্বিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। এছাড়া মহানবীর (সা.) মাধ্যমে আরব ভূমিতে যে বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়েছিল সে বিপ্লব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান থাকা পূর্বশর্ত।

৯. আরবী অলংকার অভিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আরবী অলংকার তথা *'ইলমুল মা'আনী, 'ইলমুল বায়ান* ও *'ইলমুল বাদী* সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে আয়াতের অন্তর্নিহিতি ভাব উদঘাটন করা সম্ভব নয়।

১০. *উসূলুল ফিক্হ* তথা আয়াত থেকে দলীল গ্রহণের নিয়মাবলী ও মাস'আলা উদ্ভাবন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। *এছাড়া 'ইলমুল ফিক্হ* সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে। আল-কুরআনের আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে আয়াত সংশ্লিষ্ট মাসআলা আলোচনা ও উদ্ভাবনের জন্য মুফাসসিরের *ফিক্হ* বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান থাকা অনস্বীকার্য।

১১. আল-কুরআনের নাসিখ এবং মানসূখ আয়াত সম্পর্কে *'ইলম* থাকতে হবে। কেননা আল-কুরআনের কিছু কিছু আয়াতের বিধান বিশেষ কারণে অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে কিন্তু আয়াতের তিলাওয়াত অক্ষত রয়েছে। আবার তিলাওয়াত রহিত হয়েছে কিন্তু হুকুম বাকী আছে। এরূপ আয়াতগুলো সম্পর্কে মুফাসসিরকে জানতে হবে।

১২. *'উলূমুল কুরআনের* বিভিন্ন দিক তথা অহী, *আসবাবুন নুযূল, মুহকাম, মুতাশাবিহ, ই'জায, আমছাল, তাশবীহ, মাক্কী, মাদানী* সূরাহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

১৩. আল-কুরআনের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। এগুলো বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান না থাকলে আল-কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয়।

১৪. আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান থাকতে হবে। এ ধরণের জ্ঞানকে *'ইলমুল মাওহাবী* বা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বলা হয়।

আরবী ভাষাসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় আল-কুরআনের অসংখ্য তাফসীর প্রণীত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রণীত তাফসীর গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এ ভাষায় হাতে গোনা দু'চারটি মৌলিক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আর বেশ কিছু প্রমাণ্য তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। তাই বাংলা ভাষাভাষী লোকদের নিকট আল-কুরআনের অমোঘ বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পৌঁছে দেয়া আজ সময়ের দাবি। এ দাবি পূরণে আমাদের দেশের খ্যাতিমান 'আলিম ও পণ্ডিতগণের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাহলে দেশের কুরআন প্রেমিক তাওহীদী জনতার দীর্ঘদিনের লালিত আশা পূরণ হবে। ভবিষ্যৎ এ দেশের বিশিষ্ট 'আলিমগণ আল-কুরআনের এ মহৎ কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের তাফসীর প্রণয়ন এক দুরূহ কাজ ও শ্রমসাধ্য বিষয়। এ কাজে হাত দেয়া সত্যিই আমার জন্য দুঃসাহস দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় মুফাসসিরের পরিচয় ও যোগ্যতা সম্পর্কে যে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে সে আলোকে তাফসীর করার আমার কোন যোগ্যতা নেই। আমি একজন গুনাহ্গার বে'আমল ও বিদ্যাহীন ব্যক্তি। তাই এ কাজে হাত দেয়ার ধৃষ্টতা আমার জন্য সত্যিই বড় বেমানান। তবুও দীর্ঘদিন ধরে মনের গহীন কোঠায় লালিত আশায় আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে এ মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। এ পৃথিবীতে ক্ষণিকের জন্য এসেছি কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এসেছি তার কোন বাস্তব প্রতিফলন ঘটেনি আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে। সামান্যতম কোন নেক 'আমলকে উপজীব্য করে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর সমীপে যে উপস্থিত হবো তাও অর্জনের সক্ষম হয়নি। তাই এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল-কুরআনের সূরাহ্ ভিত্তিক তাফসীর রচনার

কাজে হাত দিয়েছি এবং এর নাম দিয়েছি *তাইসীরুত তাফসীর* (সহজ তাফসীর)। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াশটুকু যদি মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে গৃহীত হয় তাহলে এটি হবে আমার জন্য পরম পাওয়া এবং আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার একমাত্র প্রধান অবলম্বন।

মনের সুপ্ত আশা ও অদম্য স্পৃহা আমাকে এ মহৎ কাছে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যুগিয়েছে সাহস ও ক্রিয়াশীল পদক্ষেপ। তাফসীর করার আমার ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকায় এক্ষেত্রে আমি একজন সংকলকের ভূমিকা পালন করেছি। আরবী ভাষায় রচিত আল-কুরআনের প্রাথমিক ও আধুনিক প্রমাণ্য তাফসীর গ্রন্থগুলো থেকে আয়াতের তাফসীর একত্রিত করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছি। প্রায় ৫০ খানা তাফসীর গ্রন্থকে মন্থন করে এ গ্রন্থ রচনা করার চেষ্টা করেছি। তাফসীর সংকলনের ক্ষেত্রে কুরআন গবেষক, পাঠক পাঠিকার আবেগ অনুভূতি ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে তাফসীর জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *আত-তাফসীরুল মুনীর ফীল 'আকীদাহ্ ওয়াশ শরীয়াহ্*-এর নন্দিত লেখক প্রফেসর ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লীর ধারা অনুসরণ করেছি। যাতে পাঠকগণ কুরআনের বিষয়গুলো অতি সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হন। আমি প্রথমে সূরার আয়াতগুলো বিষয়ভিত্তিক শিরোনামে অধিভুক্ত করে আয়াতগুলোর সরল বংগানুবাদ করেছি। এরপর আয়াতে বর্ণিত অনেক জটিল শব্দের বিশ্লেষণ করেছি। তৎপর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের শানে-নযূল বর্ণনা করে প্রত্যেক আয়াতের আলাদা আলাদা তাফসীর করেছি। পরিশেষে সাধ্যানুযায়ী আয়াতগুলো থেকে উদ্ভাবিত শর'ঈ মাসআলা সমূহের তথ্যভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিগত অভিমত প্রদান করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করেছি এবং সলফে সালিহীনের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছি।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে এ সূরার তাফসীর রচনার কাজে হাত দিই। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে যথা সময়ে এটি শেষ করতে পারিনি। অবশেষে আজ ২৮ রমাযান ২০১১-তে এ সূরার তাফসীর শেষ করতে পারায় আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। একমাত্র তাঁরই কৃপায় ও অনুগ্রহে এ দুরূহ কাজটি আজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করাই আমি এর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রফেসর এ.কে.এম. আব্দুল লতিফ ভাইকে। তিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও ইন্টারনেট থেকে

অনেক হাদীস তাখরীজ করে দিয়েছেন। আমি তাঁর দীঘায়ূ কামনা করি। গ্রন্থটির সার্বিক সজ্জায়ন ও প্রমাদমুক্ত করার ক্ষেত্রে স্নেহের ছোটভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. জাহিদুল ইসলামের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞার সাথে স্মরণ করছি। সে রাত জেগে এ গ্রন্থের একাধিকবার প্রুফ দেখেছে। আল্লাহ্ তার মঙ্গল করুন।

সর্বশেষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'উলামায়ে কিরাম ও সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমার সনির্বন্ধ নিবেদন, এ গ্রন্থের কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি, তথ্য বিভ্রাট বা অসামঞ্জস্য কোন বক্তব্য আপনাদের নযরে পড়লে তা আপনারা মেহেরবাণী করে জানাবেন এবং পরামর্শ দিবেন। আপনাদের এ মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সে আলোকে পরবর্তী সংস্করণ পরিমার্জন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে বিদায়লগ্নে মহান আল্লাহ্র দরবারে অশ্রুসজল নয়নে মনের এ অভিব্যক্তি ও আকুতি জানাই,

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয় সূচি

سُورَةُ الحُجُرَاتِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟
أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ﴿٧﴾
فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَآئِفَتَانِ
مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا
عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ
فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ
عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ
ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿١١﴾
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ
وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن
قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾
إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟
وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ
يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۟ ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا۟ عَلَىَّ إِسْلَٰمَكُم ۖ بَلِ ٱللَّهُ
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ
يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সূরাহ্ আল-হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা: ১৮

হুজুরাত শব্দের অর্থ ও নামকরণ

হুজুরাত (حجرات) শব্দটি বহুবচন, একবচন حجرة । আরবী অভিধানে এর অর্থ হলো, কক্ষ, কামরা, কুঠরী। এছাড়া শব্দটি 'ইবাদত খানাহ্ এবং পার্শ্ব কিনারা বুঝাতেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।[১] আর সাধারণ পরিভাষায়

هى القطعة من الأرض المحجورة أى الممنوعة عن الدخول[২]

'চতুর্দিক দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত যমীনের ছোট অংশকে *হুজুরাহ্* বলা হয়। অর্থাৎ সেখানে সাধারণ প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।' এখানে *হুজুরাহ্* দ্বারা রাসূল (সা.) ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের বাসগৃহকে বুঝানো হয়েছে।[৩] রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করার পর হযরত আবূ আইউব আল-আনসারীর (রা.) বাড়ীতে সর্বপ্রথম অবস্থান করেন। মদীনায় আগমনের পর তাঁর বাড়ীর সন্নিকটে রাসূল (সা.)-এর *কাসওয়া* নামক উটনী যে স্থানে বসে পড়েছিল সেখানেই পরবর্তীতে *মসজিদে নববী* নির্মাণ করা হয়। মসজিদ সংলগ্ন চারদিক উন্মুক্ত খেজুর পাতার ছাউনী দিয়ে একটি চাতাল তৈরী করা হয়। এটিই ছিল *আসহাবুস সুফ্ফাহ্*-এর আবাসস্থল। পাশাপাশি মসজিদ সংলগ্ন দু'টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। কক্ষ দু'টি দশ হাত প্রস্থ এবং উচ্চতায় ছিল সাত হাত। এর একটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা.) অপরটি হযরত সাওদাহ্ (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কক্ষ দু'টি নির্মাণের পর রাসূল (সা.) হযরত আবূ আইউব আল-আনসারীর (রা.) বাড়ী থেকে এখানেই স্থানান্তরিত হন। পরবর্তীকালে কক্ষগুলোর সংখ্যা ৯টিতে উন্নীত হয়, যার প্রত্যেকটিতে রাসূল (সা.)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ অবস্থান করতেন। এ হুজুরাগুলো কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত এবং ছাদ ছিল খেজুর

---

[১] ইবনু মানযূর আল-আফরীকী, *লিসানুল 'আরাব*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি), পৃ. ১৬৮-১৬৯; লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ* (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রী.), পৃ. ১১৯।

[২] মাহমূদ আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ১৯৪।

[৩] প্রফেসর ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আত-তাফসীরুল মুনীর ফীল 'আকীদাহ ওয়াশ শরী'আহ্*, ২৬শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ২১১।

পাতার ছাউনী। *হুজুরাহ্* দ্বারা এ কক্ষগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ হুজুরায় সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. যুহায়লী উল্লেখ করেছেন যে,

وَ هِيَ حُجُرَاتُ نسائه المؤمنات الطاهرة رضى الله عنهن وكانت تسعا لكل منهن حجرة منعا من إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم وتوفيرا لحرمة بيوت أزواجه

"এ হুজুরাগুলোতে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র ৯ জন সহধর্মিনী বাস করতেন। তাঁর (সা.) কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে এবং পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মানার্থে এতে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।"[৪]

রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের পর পরবর্তীকালে উমাইয়্যাহ খলীফা ওয়ালিদ ইবন 'আব্দিল মালিকের খিলাফতকালে এগুলোকে *মসজিদে নববীর* অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ হুজুরাগুলোর মধ্যে হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর হুজুরায় রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তিনি চিরসমাহিত হন।[৫]

আল-কুরআনের অন্যান্য সূরার যেভাবে নামকরণ করা হয়েছে, ঠিক একই রীতি এ সূরাহ্র নামকরণে অনুসৃত হয়েছে। এ সূরাহ্র ৪নং আয়াতের إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরাহর নাম গৃহীত হয়েছে। এ সূরাকে *সূরাতুল আখলাক ওয়াল আদাব* (سورة الأخلاق والأداب) নামেও অভিহিত করা হয়।[৬] কেননা এতে সামাজিক শিষ্টাচার, রীতিনীতি ও বিভিন্ন শর'ঈ আহকাম বিধৃত হয়েছে।

মৌলিক আদাব ও শিষ্টাচার

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ *তাফসীর আল-মুনীর ফীল 'আকীদাহ্ ওয়াশ শরী'আহ্*-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে পাঁচটি মৌলিক আদাব বা শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে। এ শিষ্টাচারগুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করা

ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করা ফরয হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা এ আনুগত্যের বিষয়টি প্রমাণিত। ঐ সকল আয়াতে আল্লাহর পর সাথে সাথে রাসূল (সা.)কে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। তাই আল্লাহর আনুগত্য না করলে মানুষ

---

৪ *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২১১।

৫ *প্রাগুক্ত*।

৬ *প্রাগুক্ত*।

যেমন, কাফির হয়ে যায় তেমনি রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য না করলেও মানুষ কাফির হয়। যেমন, আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[৭]

'হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রগামী হয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞানী।'

২. রাসূল (সা.) কে মর্যাদা দান

ঈমানের অনিবার্য দাবি হলো, রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করা এবং তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। এটি আল্লাহকে ভালবাসারও দাবি। তাই তাঁর সাথে ভদ্র আচরণ করা এবং তাঁকে মর্যাদা দিয়ে কথা বলা স্বয়ং আল্লাহরই নির্দেশ। যেমন, আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ[৮]

'হে ঈমানদারগণ। তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন, তোমরা নিজেরা পরস্পরের সাথে বলে থাক। এমন যেন না হয় (এতে) তোমাদের কর্ম ধ্বংস হয়। অথচ তোমরা বিষয়টি জানো না। যারা আল্লাহর ও রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই সেই সমস্ত লোক, যাদের অন্তকরণকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহাপুরস্কার।'

৩. পরিবেশিত সংবাদের যাচাই

কোন সংবাদ বা খবর শোনা মাত্রই তা বিশ্বাস করা অথবা সে অনুযায়ী ক্রিয়াশীল হওয়া মোটেই সমিচীন নয় এবং এক্ষেত্রে উক্ত সংবাদের যাচাই করা অথবা পরীক্ষা করা অনস্বীকার্য। যাচাই বাছাই ব্যাতিরেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[৯]

---

[৭] সূরাহ্ আল-হুজুরাতঃ ১।

[৮] সূরাহ্ আল-হুজুরাতঃ ২–৩।

'হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ পরিবেশন করে তাহলে তা যাচাই কর। এমন যেন না হয় যে, অজ্ঞতাবশত: (না জেনে না শুনেই) তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'

৪. উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ না করা

কাউকে উপহাস করা, বিদ্রূপ করা অথবা মানহানিকর কথা বলে ছোট করা মানবতা বিরোধী এক অসভ্য আচরণ-এতে পারস্পরিক ভালবাসা বিনষ্ট হয়। এজন্য উপহাস ও বিদ্রূপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[১০]

'হে ঈমানদারগণ! পুরুষেরা যেন অন্য কোন পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য কোন মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহ্র কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই যালিম।'

৫. ছিদ্রান্বেষণ, পরনিন্দা ও খারাপ ধারণা পোষণ না করা

ইসলামে পরনিন্দা করা এবং কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণা করা হারাম করা হয়েছে। এতে সামাজিক বন্ধন ও পরস্পরের প্রতি ভাতৃত্ববোধ এবং আস্থা-বিশ্বাস নষ্ট হয়। সমাজ জীবনে নেমে আসে নৈরাজ্যতার অমানিশা। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক এক কথায় জীবনের সর্বস্তরে সৎ নিষ্ঠাবান ও কলুষমুক্ত হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য পরনিন্দা, ছিদ্রান্বেষণ এবং কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ[১১]

'হে ঈমানদারগণ! বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান মিথ্যা হয়ে থাকে। দোষ অন্বেষণ করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো

---

[৯] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ৬।

[১০] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১১।

[১১] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১২।

গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো তা খেতে তোমাদের ঘৃণা জন্মে। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্ তাওবা কবূলকারী ও দয়ালু।'

উপরিউক্ত পাঁচটি মৌলিক শিষ্টাচার এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। একজন মুমিনের জন্য এ শিষ্টাচারগুলো মেনে চলা অপরিহার্য। অন্যথায় সে মু'মিন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরাহ্ আল-ফাত্হ-এর সঙ্গে তিন দিকে দিয়ে সূরাহ্ আল-হুজুরাতের সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে[১২]

১. *সূরাহ্ আল-ফাত্হ* এ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এ সূরায় বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার নীতিমালা পরিব্যক্ত হয়েছে।

২. *সূরাহ্ আল-ফাতহ্* (وَعَدَ اللّٰهُ الذين آمنوا)[১৩] বাক্য দিয়ে শেষ হয়েছে। আর এ সূরাহ (يايها الذين آمنوا)[১৪] বাক্য দ্বারা সূচিত হয়েছে। এর কারণ হলো, আল্লাহর নিকট মু'মিনদের বিশেষ সম্মান রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে বলেন, اشدآء على الكفار ورحمائهم بينهم[১৫]। আর প্রকৃত মু'মিন আল্লাহর আনুগত্যে সদা সচেতন থাকে।

৩. এ দু'টি সূরার প্রথমভাগে রাসূল (সা.)-এর সম্মান ও মান মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর তিনি (সা.) যে বিষয়ে খুশী হন সে বিষয়ে মু'মিনদের খুশী হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এছাড়া উভয় সূরাতেই কথা ও কর্মে রাসূল (সা.)-এর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য করার জন্য মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

সূরাহ্ আল-হুজুরাত মাদানী সূরাহ্সমূহের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরাহ্। মাত্র আঠারটি আয়াতে সমাপ্ত এ সূরায় সামাজিক বিধি-বিধানের মূলতত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য মাদানী সূরাহ্ অপেক্ষা এর-প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ৫ বার يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বাক্য উল্লেখ করে সৃষ্টি জগতের লালন, বিকাশ, পরিবৃদ্ধি এবং

---

[১২] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২১২।

[১৩] সূরাহ্ আল-ফাতহ্: ২৯।

[১৪] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১।

[১৫] সূরাহ্ আল-ফাতহ্: ২৯।

আল্লাহর আইন ও বিধানের বহু মূলনীতি উল্লেখ করে মুসলমানদের মধ্যে কেবল ঈমানদারদেরকে তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূরাটি কিছু মহৎ, উদার, পরিচ্ছন্ন ও নির্মল সামাজিক উপকরণ চিহ্নিত করেছে, যার মাধ্যমে এক সুশৃঙ্খল সমাজের গোড়াপত্তন করা যেতে পারে। আর এ বিধি-বিধান সমাজের স্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত করবে। যে সমাজে মানুষ হবে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাবান, রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল, আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন, অন্যের সম্মান ও মর্যাদার রক্ষক এবং নিজ চিন্তাভাবনা ও চালচলনে হবে নিয়মানুবর্তী।

যে সমস্ত কলহ সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় তার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী বিধান এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যে কার্যকরী বিধানের মূলভিত্তি হলো, মু'মিনদের মধ্যকার সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায় বিচার ও মিমাংশা নীতি এবং আল্লাহভীতি। এছাড়া মানব জাতির ঐক্যের পূর্ণাঙ্গ ধারণা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবর্তিত নিখুঁত ও নির্মল মানদণ্ড উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সূরাহ্ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا[১৬]

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে পরিণত করেছি, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার'।

এ সূরার আরেকটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো এই যে, এতে কুরআনের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে এবং রাসূল (সা.)-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুশীল সমাজ গঠনের জন্য জোরদার ও আপোষহীন প্রয়াশ চালানো হয়েছে। কুরআননির্ভর সুশীল সমাজ পৃথিবীতে এক সময় আবির্ভূত হয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চালু ছিল। সুতরাং ইসলামের এ কাঙ্খিত সমাজ এ বিশ্বে কোন অবাস্তব বা আকাশকুসুম কল্পনা নয়। আর এই সুশীল সমাজ আকস্মিকভাবে রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তা পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনো এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

---

[১৬] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৩।

এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের যে সমস্ত সামাজিক গুণাবলী ও মহৎ আচরণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন তা নির্দেশ করাই হলো এ সূরার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তু

মুসলমানদেরকে উত্তম শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। ইসলামী শরী'আতের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। যেমন,

১. রাসূল (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর আনুগত্য

রাসূল (সা.)কে সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর আনুগত্য করাকে ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালাকে রব এবং রাসূল (সা.)কে পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে মেনে নেয়ার পর একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তাদের যে কোন বিধান ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেয়া। আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সিদ্ধান্তের মুকাবিলায় ব্যক্তিগত অথবা কোন নেতার সর্বপ্রকার সিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ করা। এটিই ঈমানের মৌলিক দাবি। রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো প্রকৃত ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। যেমন, আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[১৭]

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাতশীল।'

২. কণ্ঠস্বর নিম্নগামী করা

উচ্চ কণ্ঠস্বরে কথা বলা মানব চরিত্রের অপ্রীতিকর আচরণের পরিচায়ক। এটি প্রথমতঃ শিষ্টাচার বিরোধী, উপরন্তু নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। রাসূল (সা.)-এর মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাঁর সাথে কথা বলার সময় অথবা তাঁর সম্মুখে অন্য কারো সাথে কথা বলার সময় এতটা উচ্চ কণ্ঠে কথা বলা যাবে না, যাতে রাসূল (সা.)-এর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও ম্লান হয়ে যায়; বরং অত্যন্ত আদব ও মর্যাদার সাথে নরম ও নিম্নস্বরে কথা বলতে হবে। এজন্য রাসূল (সা.)-এর সম্মানার্থে তাঁর সামনে মু'মিনদেরকে তাদের কণ্ঠস্বর নিম্নগামী করাকে *তাকওয়ার* বিষয়াভুক্ত করা হয়েছে।[১৮] যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

---

[১৭] সূরাহ্ আল-হুজুরাতঃ ১।

[১৮] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২১২।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ[১৯]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না।'

৩. রাসূল (সা.)কে নাম না ধরে ডাকা

রাসূল (সা.)কে নাম ধরে ডাকতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, [২০] وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 'উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন, তোমরা পরস্পর বলে থাক'। যদি রাসূল (সা.)কে নাম ধরে ডাকা হয়, তাহলে যে ডাকবে তার সমস্ত 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ বলেন, [২১] أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ 'এর ফলে তোমাদের অজান্তে তোমাদের 'আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।'

৪. সংবাদের সত্যতা যাচাই

এ সূরায় পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা যাচাই-বাছাই-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে মু'মিনরা কোন মিথ্যা খবর প্রচার ও তা কার্যকরণে জড়িয়ে পড়তে না পারে। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছাবে, তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে সংবাদ বাহক কেমন ব্যক্তি তা যাচাই করে দেখতে হবে। সে যদি কোন ফাসিক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়, তাহলে তার দেয়া সংবাদ অনুযায়ী কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কী তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। বস্তুতঃ যার চরিত্র ও কাজ-কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন সংবাদদাতার সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকার বা ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ পরিবেশন করে, তোমরা তা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।'

৫. পারস্পরিক বিবাদ নির্মূল করা

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সমাজিক জীব। সমাজে মানুষ তার আত্মসম্মান নিয়ে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে চায়। পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদ, সন্ত্রাস বা যুদ্ধ

---

[১৯] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১।

[২০] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ২।

[২১] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ৩।

বিগ্রহ সমাজ জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। এছাড়া সমাজে দু'দল লোকের মাঝে আত্মকলহ সৃষ্টি হলে তা দ্রুত মিমাংসা করা অত্যন্ত জরুরী। কীভাবে মিমাংসা করতে হবে তা এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ[২২]

'ঈমানদারদের মধ্যে দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দাও, তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করবে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।'

৬. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ

এ সূরায় মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা একজন মু'মিন অপর একজন মুমিনের ভাই, তারা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যারা তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস রাখে। তারা স্থান, কাল, পাত্র, বর্ণভেদে একই সূত্রে গ্রথিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[২৩]

'মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে।'

৭. উপহাস না করা

কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার দোষ অপরের কাছে এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে *সুখরিয়াহ্* তথা ঠাট্টা বা উপহাস বলে। এ ঠাট্টা বা উপহাস করার অর্থ কেবল কথার মাধ্যমে হাসি-তামাসা করাই নয়; বরং কারো কোন বিশেষ কাজের অভিনয় করা কিংবা তার প্রতি ইঙ্গিত করে হাসাহাসি করা। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে এগুলো হারাম। কেননা এটি একটি জঘন্যতম কাজ। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। এতে পারস্পরিক ভাতৃত্ব বন্ধনও নষ্ট হয়। এজন্য এ সূরায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

---

[২২] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ৯।

[২৩] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১০।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ[২৪]

'পুরুষেরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য কোন মহিলাদের বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।'

৮. পরস্পরকে দোষারোপ না করা

সমাজ জীবনে একটি গুরুতর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী বিষয় হচ্ছে কোন মুসলিম ভাইকে তার সাক্ষাতে বা অন্য কোন লোকের সামনে তার দোষ-ক্রটি প্রকাশ করে উক্ত দোষের কারণে তাকে লজ্জা দেয়া। এরূপ আচরণের ফলে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। কারণ এরূপ অবমাননা কোন মানুষই সহ্য করতে পারে না। এজন্য একে অপরকে দোষারোপ করতে এ সূরায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মানুষ দোষ ক্রটির উর্ধ্বে নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ[২৫] 'তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করো না'।

৯. বিকৃত নামে আহ্বান করা নিষিদ্ধ

ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে অনৈসলামিক কিংবা মন্দ নামে ডাকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[২৬]

'তোমরা পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। আর যারা একাজ থেকে তাওবা করে না তারাই যালিম।'

১০.গুপ্তচরবৃত্তি বা ছিদ্রান্বেষণ না করা

অপরের দোষক্রটি জানার উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি বা ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো প্রতি ধারণার বশবর্তী হয়ে অথবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্থ করা অথবা নিজের কৌতুহল ও উৎসুক্য নির্ধারণের জন্য কারো ছিদ্রান্বেষণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যেমন, আল্লাহ বলেন, وَلَا تَجَسَّسُوا[২৭] 'তোমরা ছিদ্রান্বেষণ

---

[২৪] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১১।

[২৫] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১১।

[২৬] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১১।

[২৭] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১২।

করো না'। কেননা একে অপরের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ালে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় বিধায় এগুলো পরিত্যাগ করা অপরিহার্য।

১১. কু-ধারণা করা নিষিদ্ধ

একজন মুসলমান ভাই তার অপর মুসলিম ভাই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত সন্দেহ করার কারণে তাদের মধ্যকার প্রেম-ভালোবাসা তিরোহিত হয়। তাই ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে কু-ধারণা কিংবা ক্ষতিকর অনুমানের উপর নির্ভরশীল হতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ[২৮]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পর বেশী বেশী ধারণা থেকে বিরত থাক, কেননা কোন কোন ধারণা ও অনুমান গুনাহের কাজ।'

১২. গীবত বা পরনিন্দা নিষিদ্ধ

পরনিন্দা ও গীবত একটি জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে ইসলামী শরী'আতে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একে সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ[২৯]

'আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে নিজের আপন ভাই-এর গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?'

১৩. জাতীয় আভিজাত্য ও বংশ কৌলিণ্যের অহংকার না করা

এ সূরায় যে সমস্ত জাতি, বংশ ও গোত্র বৈষম্য মানব সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেগুলোর মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। জাতি-বর্ণ, গোত্র, বংশীয়-পারিবারিক মর্যাদা এবং আভিজাত্য নিয়ে গৌরব ও অহংকার করা, অন্য লোকদেরকে নিজেদের অপেক্ষা হীন ও অবজ্ঞা করা অথবা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্য লোকদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ সূরায়

---

[২৮] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১২।

[২৯] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১২।

আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির সৃষ্টির রহস্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও বৈষম্য দূর করার ঘোষণা দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا[৩০]

'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।'

১৪.মর্যাদার মাপকাঠি

মানুষের আভিজাত্য, বংশ কৌলিণ্যতা ও ধন সম্পদ তার মর্যাদার মাপকাঠি হতে পারে না। একমাত্র তাকওয়া হলো মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[৩১]

'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী'।

১৫. পূণ্য কাজে লৌকিকতা নিষিদ্ধ

কারো কোন উপকার করে তা প্রকাশ করা অথবা তাকে খোঁটা দেয়া এ সূরায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে উপকৃত ব্যক্তি মনে কষ্ট পায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ[৩২]

'এ সব লোক আপনাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার উপকার করেছে। তাদের বলুন, ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছ একথা মনে করো না; বরং আল্লাহ তোমাদের উপকার করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি হিদায়াত করেছেন যদি তোমার সত্যবাদী হও'।

১৬.ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

সূরাটিতে আরব বেদুঈনদের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পাথর্ক্য সূচনা করা হয়েছে এ ভাবে:

---

[৩০] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৩।

[৩১] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৩।

[৩২] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৭।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ[৩৩]

'আর বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদের বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি; বরং বল, আমরা অনুগত হয়েছি। ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি'।

১৭.ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য

এ সূরায় পূর্ণ ঈমানদারদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ঈমানদার তারা নিজেদেরকে সর্বতোভাবে আল্লাহর জন্য সোপর্দ করবে। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ[৩৪]

'প্রকৃত ঈমানদার তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে তারা কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারাই সত্যবাদী।'

---

[৩৩] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৪।
[৩৪] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৫।

তাফসীর

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। ভদ্রতা ও উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে রাসূলকে (সা.) সম্বোধন করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

অনুবাদ

১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ো না, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

২. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন, তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ কর্ম নষ্ট হয়ে যায়।

৩. যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

৪. হে নবী! যারা আপনাকে গৃহের থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. যদি তারা আপনার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا تُقَدِّمُوا তোমরা কোন নির্দেশ, হুকুম অথবা অভিমতের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রগামী হয়ো না। لَا تُقَدِّمُوا বাক্যটি مقدمة الجيش থেকে উদ্ভূত। আর সৈন্যবাহিনীর অগ্রগামী দলকে مقدمة الجيش বলা হয়। বাক্যটির অর্থ হলো, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত কোন কথা বলো না। بَيْنَ يَدَيِ 'উভয় হাতের মধ্যে'-এর দ্বারা রূপকভাবে সেই দুরত্বকে বুঝায়, যা দু' বিপরীত দিক তথা ডান ও বামের মধ্যে নিকটবর্তী। এর অর্থ হলো, সামনা সামনি। وَاتَّقُوا اللَّهَ আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে সতর্ক হও। لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ তোমরা উঁচু করবে না তোমাদের কণ্ঠস্বর। فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবীর কণ্ঠস্বরের উপর। وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

তোমরা উঁচু আওয়াজ কর না তাঁর কাছে। بِالْقَوْلِ কথা বলার ক্ষেত্রে। كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ যেমন, উচুঁ হয় তোমাদের কণ্ঠস্বর তোমাদের একে অপরের সাথে কথা বলার সময়। أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ এমন যেন না হয় যে, তোমাদের 'আমল নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ নবীর সামনে তোমাদের উচুঁ কণ্ঠস্বর অথবা উঁচু আওয়াজ যেন তোমাদের 'আমল নষ্ট হওয়ার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ এবং তোমরা তা টেরও পাবে না, বুঝতেও পারবে না।

الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ যারা নবীর সামনে নিজ কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী করে। أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ তারা ঐ সমস্তলোক যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন তাকওয়ার জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তাকওয়া অর্জনের জন্য পছন্দ করেছেন। لَهُم مَّغْفِرَةٌ তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ও মহা পুরস্কার (কণ্ঠস্বর নিম্নগামী করার জন্য।) وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ হুজুরার পেছন থেকে। এখানে হুজুরাহ দ্বারা রাসূল (সা.)-এর গৃহকে বুঝানো হয়েছে। أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ এদের অধিকাংশই বুঝে না। অর্থাৎ যে সমস্ত লোক নবী করীমকে (সা.) তাঁর গৃহের বাইর থেকে উঁচু স্বরে ডাকাডাকি করে তারা অধিকাংশই নির্বোধ। وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদের নিকট বের হয়ে আসেন। لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ তাহলে তাদের জন্য এটি উত্তম হত। وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল। অর্থাৎ যারা রাসূলের সাথে শিষ্টাচার বহির্ভূত ব্যবহার করেছে তাদের এই কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর তিনিতো মার্জনাকারী ও দয়াময় প্রভূ।

শানে নুযূল

১নং আয়াতের শানে নুযূল

এক. ইবনুল মুনযির হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদল লোক কুরবানীর দিনে রাসূল (সা.)-এর পূর্বেই কুরবানীর জন্তু জবাই করেছিল। অতঃপর তাদেরকে পুনরায় কুরবানীর পশু জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়: [১]

---

[১] আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ১২০; *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৩২৫; আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দুই. ইবনু আবিদ দুন্ইয়া *আল-আযাহী* অধ্যায়ে হযরত হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পূর্বেই এক ব্যক্তি তার কুরবানীর পশু জবাই করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২]

তিন. ইমাম তাবারানী তার বিখ্যাত *মু'জাম আল আওসাত* গ্রন্থে হযরত (রা.) 'আয়িশা থেকে বর্ণনা করেন, একদল লোক কোনো এক মাসকে অগ্রগামী করে রাসূল (সা.)-এর পূর্বেই রোযা রাখে তখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৩] এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) যে রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ইমাম বুখারী বলেন, ইবন আবী মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন যুবাইর (রা.) তাদেরকে জানিয়েছেন, একবার তামীম গোত্রের একদল লোক সওয়ার হয়ে নবী (সা.)-এর নিকট আসল এবং একজন প্রতিনিধির আবেদন করল। আবূ বকর (রা.) বললেন, কা'কা ইবন মা'বাদকে আমীর বা নেতা বানানো হোক। 'উমর (রা.) প্রস্তাব করলেন, 'আকরা ইবনে হাবিসকে আমীর বানানো হোক। তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। 'উমর (রা.) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার আমার আদৌ কোন ইচ্ছে নেই। এ নিয়ে দু'জন তর্ক বিতর্ক শুরু করলেন, এমনকি দু'জনেরই কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠে গেল। এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আয়াতটি নাযিল হলো,[৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে আগ বেড়ে যেওনা।'

২নং আয়াতের শানে নুযূল

এক. ইবনু জারীর আল-তাবারী কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল (সা.)-এর সামনে উঁচু আওয়াযে কথা বলেছিলেন, তখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৫] কেউ কেউ বলেন,

---

খ্রী.), পৃ. ৫৭৪; আল-খাযিন, *লুবাবুত তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ১৭৫; *যাদুল মাসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১৯।

২ আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছুর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুর রিহাব, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৯৫।

৩. আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৩৪; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৬।

৪ ইমাম বুখারী, *আল-জামি'উস সহীহ* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৮৫৭।

৫ আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ১৩৬।

আয়াতটি ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাসকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়। তিনি ছিলেন উঁচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী। তাঁর কানে ছিল সমস্যা। যার কারণে তিনি কম শুনতে পেতেন। তাই তিনি কারো সাথে কথা বললে উচ্চস্বরে কথা বলতেন। একদা তিনি রাসূল (সা.)-এর সামনে উঁচুস্বরে কথা বললে তিনি (সা.) এতে কষ্ট পান। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[৬]

দুই. যখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস ঘরে বসে থাকতে লাগলেন। রাসূল (সা.)-এর মজলিসে আসা বন্ধ করে দিলেন এবং বলতে লাগলেন আমি দোযখী। নবী করীম (সা.) সা'দ ইবন মু'আয (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ 'উমার! ছাবিতের খবর কী? সে কি অসুস্থ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার পড়শী কিন্তু আমিতো তার কোন খবর জানিনা। এরপর তিনি ছাবিতের নিকট আসলেন এবং নবী করীম (সা.)-এর কথা তাকে বললেন। ছাবিত তার শুনে কথা বললেন, আপনারা তো জানেন, আমি সবচে উঁচু কণ্ঠস্বরে রাসূল (সা.)-এর সাথে কথা বলি। সম্ভবত لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি আমার ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। তাই আমি দোযখী হয়ে গেছি। ছাবিতের এ কথা শুনে সা'দ নবী করীমকে (সা.) জানালে তিনি বললেন, সে দোযখী নয়, সে জান্নাতী।[৭]

তিন. ইবনু জারীর আল-তাবারী কাতাদা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আরব বেদুঈন রাসূল (সা.)-এর হুজুরাহ্র পার্শ্ব থেকে উচ্চস্বরে কথা বলত এবং নাম ধরে ডাকতো, তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[৮] অপর এক বর্ণনায় আয়াতটির অবতীর্ণের কারণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে যে, আয়াতটি ছাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তার কানে সমস্যা ছিল বলে তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন। তিনি একদা তার অভ্যাস অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বললে তিনি (সা.) এতে কষ্ট পান। ফলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৯] ইমাম বুখারীর বর্ণনায় কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন ছাবিত পেছনে বসতেন। প্রিয় নবী (সা.) তাকে ডাকলেন এবং এর কারণ

---

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭; *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৬।

৭ আত-তাফসীরুল মাযহারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০; *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৬; আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ১৩৯১।

৮ *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৩৬; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০।

৯ আবূল লাইছ আল-সামারকান্দী, *বাহরুল 'উলূম*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩হি./১৯৯৩ খ্রী.) পৃ. ২৬১; *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২১৬-২১৭।

জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا আয়াতটি নাযিল হলো, কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর তো উঁচু। সুতরাং আমি আমার 'আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছি। একথা শুনে রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি কল্যাণের সাথে দুনিয়ার জীবন যাপন করবে এবং কল্যাণের সাথেই তোমার মৃত্যু হবে। তুমি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ছাবিত ইবন কায়স বলেন, এরপর থেকে আমি কখনও রাসুলের (সা.) সামনে আর উচ্চস্বরে কথা বলিনি।[১০]

৩নং আয়াতের শানে নুযূল

ইবন জারীর আল-তাবারী ও আল-বাগাবীসহ সংখ্যাগরিষ্ট তাফসীরকার লিখেছেন যে, যখন لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন ছাবিত পথের মধ্যে বসেই কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হযরত 'আসিম ইবন 'আদী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ছাবিত বললেন, لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি সম্ভবত: আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। কেননা আমার কণ্ঠস্বর তো উঁচু। তাই আমার 'আমল নষ্ট হওয়ায় আমি দোযখী হওয়ার আশঙ্কা করছি। 'আসিম একথা রাসূল (সা.)কে জানালেন। এদিকে ছাবিতের আর্তনাদ এতই প্রবলতর হলো যে, তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় স্ত্রী জামিলাকে জানালেন, 'যখন আমি তোমার ঘোড়ার আস্তাবলে যাব তখন তুমি ঘোড়ার রশি দিয়ে খুঁটির সাথে আমার পা দু'টি শক্ত করে বেঁধে দেবে'। তাঁর স্ত্রী তা-ই করলেন। এরপর হযরত ছাবিত বললেন, এখন আমি আর বের হব না যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার মৃত্যু ঘটাবেন কিংবা রাসূল (সা.) আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। রাসূল (সা.) 'আসিমকে বললেন ছাবিতকে ডেকে নিয়ে এসো। প্রিয় নবীর (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী 'আসিম প্রথমে ছাবিতকে যেখানে দেখেছিলেন সেখানে গেলেন, কিন্তু তিনি তাকে সেখানে না পেয়ে তাঁর ঘরে দেখতে পেলেন, তিনি (ছাবিত) আস্তাবলে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছেন। 'আসিম বললেন, রাসূল (সা.) তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ছাবিত বললেন, আমার বাধন ছিন্ন কর। বন্ধন ছিন্ন করা হলে উভয়ই রাসূল (সা.)-এর দরবারে পৌছলেন। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার কান্নার কারণ কী? ছাবিত বললেন,

---

[১০] সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসের মূল ভাষ্য হলো: ان النبی صلی الله علیه وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یارسول الله انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا فی بیته منكسا رأسه فقال له ماشانك فقال شر كان یرفع صوته فوق صوت النبی صلی الله علیه وسلم فقد حبط عمله و هو من أهل النار فأتی الرجل النبی صلی الله علیه وسلم فأخبره انه قال كذا كذا فقال موسی فرجع الیه المرة الاخري ببشارة عظیمة فقال اذهب الیه فقل له انك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة দ্রষ্টব্য: *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, বাবু লা-তারফা'উ আস-ওয়াতাকুম ফাউকা সাউতিন নাবী, হাদীস নং, ৪৮৪৬, পৃ. ৮৫৭।

আমার কণ্ঠস্বর উঁচু। আমি আশঙ্কা করছি আয়াতটি আমার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূল (সা.) বললেন,

أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قال رضيت ولا أرفع صوتى أبدا على صوت رسول صلى الله عليه وسلم

'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি প্রশংসাযোগ্য জীবন যাপন করবে এবং শহীদ হবে। আর জান্নাতে প্রবেশ করবে। ছাবিত (রা.) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুসংবাদে সন্তুষ্ট। আমি আর কখনো আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সামনে কণ্ঠস্বর উঁচু করব না'।[১১] তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়;

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

৪নং আয়াতের শানে নুযূল

এক. ইমাম ছা'লাবী হযরত জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা উয়ায়নাহ্ ইবন হিস্ন এবং আকরা' ইবন হাবিস সত্তরজন লোকসহ দুপুরের সময় মদীনায় এসেছিলেন। নবী করীম (সা.) তখন তাঁর কোন এক সহধর্মিনীর হুজুরায় নিদ্রিত ছিলেন। তখন ঐ দু'জন উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, মুহাম্মাদ বাইরে এসো। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১২]

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

দুই. ইমাম 'আব্দুর বায়যাক হযরত কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! আমি কারো প্রশংসা করলে তা তার জন্য সৌন্দর্যশীল হয় আর কাউকে গালি দিলে তা তার জন্য দূষণীয় হয়। নবী

---

[১১] ইমাম আবূ স'উদ, *ইরশাদু 'আকলিস সালিম ইলা-মাযায়াল কুরআনিল কারীম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ১৭৭; *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১; *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৩৬-১৩৭; *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২০; *আদ-দুররুল মানছুর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৮; *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৬; *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬; *আল-জামি'-লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭।

[১২] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হিসান*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ২৬৭।

করীম (সা.) বললেন, কেবল আল্লাহই এরূপ করলেই হয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১৩]

তিন. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, আয়াতটি তামীম গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের আচরণের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। তারা একবার মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলের হুজুরার বাহির থেকে উঁচু আওয়াজে বলতে লাগল,

يا محمد أخرج الينا فإن مدحنا زين وان ذمنا شين

'হে মুহাম্মদ! আমাদের নিকট বের হয়ে আসুন। আমাদের প্রশংসা সৌন্দর্যশীল। আর আমাদের দুর্নাম দুষনীয়'। তাদের এ উঁচু চিৎকার রাসূল (সা.)কে কষ্ট দেয়। তাদের এরূপ আচরণের প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।[১৪]

চার. কোন কোন তাফসীরকার লিখেছেন যে, একদা কতিপয় আরব বেদুইন নবী করীম (সা.)-এর হুজুরার সামনে এসে يا محمد اخرج الينا 'হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন' বলে চিৎকার করতে আরম্ভ করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১৫]

তাফসীর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোন বিষয়ে অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক শ্রবণকারী সর্বজ্ঞ।) এ আয়াতে কোন্ বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়নি। তবে আয়াতটির শানে-নুযূলের দিকে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর যে কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা এবং তাঁদের নির্দেশের বাইরে না যাওয়া। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী কোন বক্তব্য না দেয়া এবং শরী'আতের বিপরীত কোন কাজ না করা।[১৬] কোন কোন তাফসীরকার লিখেছেন যে, এ আয়াতের

---

[১৩] *ফাতহুল কাদীর*, পৃ. ১৩৯১; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০১।

[১৪] *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬; *আল-জামি'-লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮০; *যাদুল মাসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২০।

[১৫] *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪১।

[১৬] *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৫।

মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর যে-কোন বিষয়ে অগ্রগমনের নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হয়েছে। আর এখানে "আল্লাহর সামনে" কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে নবী করীম (সা.)-এর মাহাত্ম ও সম্মান প্রকাশের জন্য। কেননা রাসূল (সা.)-এর উপর অগ্রগামিতা যেন আল্লাহর উপরই অগ্রগমন। আল্লাহর নিকট রাসূলের মর্যাদা এত বেশী যে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই নামান্তর।[১৭] ঠিক একই বক্তব্য কুরআনের অনেক স্থানে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

'নিশ্চয় যারা বৃক্ষের নীচে আপনার হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করেছেন ঠিক তারা যেন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হাতেই বাই'য়াত করেছেন'।[১৮]

এ আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে, কথা ও কাজে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের সামনে একজন মু'মিন বান্দাহ্র কর্ম তৎপরতা নিয়ন্ত্রণপূর্বক শিষ্টাচারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ করার মধ্যে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। স্বার্থপরতা, হঠকারিতা, দ্বন্দ্ব-কলহ সংঘর্ষের মূল। এমতাবস্থায় কোন উর্ধ্বতন ব্যক্তির সঠিক মানদণ্ডের নিকট নিজের ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, মতামত ও সেচ্ছাচারিতাকে বিসর্জন দেয়া এর প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং নির্ভুল মানদণ্ড। সকল কাজে ও কর্মে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের বিধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়া ফরয হিসেবে বিবেচিত।[১৯] এ মর্মে হযরত মু'য়ায ইবন জাবাল (রা.)-এর হাদীসকে উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার রাসূল (সা.) তাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণকালে বলেছিলেন,

---

[১৭] *তাফসীর আল-খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫; *আল-জামি'-লি আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭।

[১৮] সূরাহ্ আল-ফাতহ্: ১০।

[১৯] সাইয়্যেদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুশ শুরূক, তাবি), পৃ. ৩৩৩৯-৪০; আবূ বকর জাবির আল-জাযায়িরী, *আইসারুত তাফসীর*, ৫ম খণ্ড (আল-মদীনা মুনাওওয়ারাহ্: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২০০৩ খ্রী.), পৃ. ৯৫।

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُول اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

'হে মু'আয! তুমি কিসের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, যদি তুমি আল্লাহর কিতাবে উক্ত বিষয়ের হুকুম না পাও? মু'আয বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী। এরপর রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানেও যদি না পাও তাহলে কি করবে? মু'আয বললেন, আমি আমার নিজস্ব রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা দিব। এরপর রাসূল (সা.) মুয়াযের বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে আল্লাহর রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন'।[২০]

তাবি'ঈ মুফাসসির দাহ্হাক বলেন, আয়াতটির অর্থ হলো, শরী'আত সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না মেনে ফায়সালা করা নিষিদ্ধ।[২১] মোটকথা, এ আয়াতে কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের উপর অন্য কোন বিধান বা মতাদর্শকে অগ্রাধিকার দিতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতের এ আবেদন শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তাই মুসলমানদের রাষ্ট্র, সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট বা সংসদ কোন কিছুই এ আইন থেকে মুক্ত নয়। এ সবকিছুই এ আইনের আওতাভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার উৎস এবং রাসূল (সা.)কে

---

[২০] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০২ খ্রী.), কিতাবুল কাযা, বাবু ইজতিহাদুর রায় ফীল কাযা, হাদীস নং ৩৫৯২, পৃ. ৫১৬; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯১ খ্রী.) আবওয়াবুল আহকাম, বাবু মা জাআ ফীল কাযী কাইফা ইয়াকযী, হাদীস নং ১৩২৭, পৃ. ৩২১; আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), হাদীস নং ২০১২৬; ইবনু আবী শায়বাহ্, *আস-সুনান*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৫৪৩।

[২১] *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৪০।

বিচারক মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্যের প্রতি অবিচল থাকাকে প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا[২২]

'(হে রাসূল!) না, আপনার রবের শপথ, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত এরা নিজেদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর আপনি তাদেরকে যে ফায়সালা দেবেন তা মেনে নিতে তাদের মনে সংকীর্ণতাবোধের সৃষ্টি না হয় এবং তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে দ্বিধা না হয়।'

আল-কুরআনে প্রায় ১৯ স্থানে[২৩] একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্য করার বিষয়কে শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো:

قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ[২৪]

'(হে রাসূল! বলুন) তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যদি ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না'।

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[২৫]

'তোমরা আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তাহলে তোমাদেরকে রহম করা হবে।'

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ[২৬]

'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা আত্মরক্ষা কর কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু প্রকাশ্য প্রচার।'

---

[২২] সূরাহ্ নিসা. ৬৫।

[২৩] ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *আল-মুজামুল মুফাহারাস লী-আলফাযিল কুরআনিল কারীম* (তেহরান: মাতবা'আহ্ উয়ানদা দানেশ, তাবি), পৃ. ৯১২।

[২৪] সূরাহ্ আলে-ইমরান: ৩২।

[২৫] প্রাগুক্ত: ১৩২।

[২৬] সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্: ৯২।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ[২৭]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।'

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ[২৮]

'হে রাসূল! বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তাহলে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ[২৯]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা নিজেদের কর্মকে বিনষ্ট করোনা।'

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ'। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অধিকার লঙ্ঘনকে ভয় কর এবং তাঁদের নির্দেশের বিরোধিতা করাকে ভয় কর এবং তাঁরা তোমাদেরকে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুমতি দেননি সে বিষয়ে তোমরা তাঁদের অগ্রগামী হওয়াকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কথাবার্তা শোনেন এবং তোমাদের মধ্যে নিহিত গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।[৩০]

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে। আল-কুরআনের পরিভাষায় এরূপ ভীতিকে *তাকওয়া* বলা হয়। আরবী অভিধান অনুযায়ী *তাকওয়া* শব্দের অর্থ হলো, ভয়ভীতি, আত্মশুদ্ধি, সংযমশীল হওয়া, বিরত থাকা, যে কোন ক্ষতিকারক কাজ থেকে দূরে থাকা এবং নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।[৩১] আর ইসলামী

---

[২৭] সূরাহ্ আল-আনফাল: ২০।

[২৮] সূরাহ্ আন-নূর: ৫৪।

[২৯] সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৩৩।

[৩০] *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৩৫; *তাফসীর আল-খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

[৩১] *লিসানুল 'আরাব*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৪০২-৪০৪।

শরী'য়াতের পরিভাষায়-আল্লাহকে ভয় করে সকল প্রকার ক্ষতিকারক বস্তু থেকে সতর্কতার সাথে নিজেকে বিরত রাখার নাম *তাকওয়া* ।[৩২] একদা হযরত 'উমার (রা.) *তাকওয়ার* অর্থ জানার জন্য উবাই ইবন কা'বকে প্রশ্ন করলেন, হে উবাই! *তাকওয়া* কী? এর উত্তরে উবাই বললেন, আপনি কি কখনা কাঁটাযুক্ত দুর্গম পথে চলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ । তখন উবাই বললেন, সেখানে আপনি কিভাবে পথ চলেছেন? হযরত উমর (রা.) বললেন, কাপড় ও শরীরকে কাঁটা থেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেছি । তখন উবাই (রা.) বললেন, *তাকওয়া* হলো ঐরকম নিজেকে রক্ষা করার নাম ।[৩৩]

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি । কেননা এটি ঈমানের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত । এর মাধ্যমেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে । একজন *তাকওয়াসম্পূর্ণ* মানুষ কঠিন অবস্থায়ও গর্হিত কাজ থেকে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় । আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দূর্যোগপূর্ণ অবস্থা থেকে রক্ষা করেন । যেমন, তিনি বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[৩৪]

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তাকে নিস্কৃতির পথ দেখিয়ে দেন এবং তাকে তাঁর ধারণাতীত রিযিক দান করে থাকেন ।'

হাদীসে *তাকওয়ার* গুণকে সর্বোত্তম বস্তু হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এ গুনের অধিকারী ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন, 'রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ মানুষ উত্তম? তিনি বললেন, মানুষের মাঝে যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে-ই সর্বোত্তম ।'[৩৫]

ইসলামী পণ্ডিতগণের মতে তাকওয়ার অনেক স্তর রয়েছে । কাযী আল-বায়দাবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে তিনটি স্তর এবং ইমাম আল গাযালী ৪টি স্তর উল্লেখ করেছেন । এ স্তরগুলো হলো যথাক্রমে,

---

[৩২] *তাফসীরুল বায়দাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩ ।

[৩৩] আরবী ভাষ্য: ان عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له اما سلكت طريقا ذا شوك قال بلى قال فما عملت قال شمرت واجتهدت قال فذلك التقوى *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪ ।

[৩৪] সূরাহ আত-তালাক: ২-৩ ।

[৩৫] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৬ ।

১. হারাম বস্তু পরিহার

তাকওয়ার প্রথমস্তর হলো, যাবতীয় হারাম বস্তু বর্জন করা। সুদ, ঘুষ, মদ জুয়া বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা, যেনা-ব্যভিচার, যুলুম, শোষন, সম্পদ আত্মসাৎ, মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, প্রতারণা, চোরাচালান, কালোবাজারী, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, মিথ্যা সাক্ষ্য, খুন-খারাপী, সন্ত্রাস, রাহাজানীসহ সকল প্রকার হারাম কাজ আল্লাহর ভয়ে বর্জন করা *তাকওয়ার* প্রথম স্তর।[৩৬] ইমাম আল-বায়দাবী এগুলোকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন এভাবে[৩৭] التجنب عما يضره في الأخرة অর্থাৎ পরকালের জন্য সকল ক্ষতিকারক বস্তু থেকে বেঁচে থাকার নাম *তাকওয়া*। তিনি আরো লিখেছেন যে, *তাকওয়ার* প্রথম পর্যায় সাধারণ মু'মিনদের পর্যায়। ঈমান গ্রহণের পর শিরক থেকে বেঁচে থাকাও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى[৩৮] 'তিনি তাদের জন্য তাকওয়ার কালেমা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এখানে *তাকওয়া* দ্বারা তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে।[৩৯]

২. সন্দেহজনক হালাল বস্তু বর্জন

ইসলামী শরী'য়াতে হারাম বস্তু ও অবৈধ কাজ পরিহার করার পর একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সন্দেহজনক সকল হালাল বস্তু থেকেও নিজেকে বিরত রাখা *তাকওয়ার* দ্বিতীয় স্তর। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,[৪০] دع ما يريبك الى ما لا يريبك 'যে বস্তু তোমাকে সন্দেহে পতিত করে সে বস্তুকে এমন বস্তুর দিকে ছেড়ে দাও, যা তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিপতিত করে না। অর্থাৎ যে বস্তুতে তোমার সন্দেহ হয় তা পরিহার কর। আর যে বস্তুতে সন্দেহ জন্মে না তা গ্রহণ কর।' কাযী আল-বায়দাবী গুনাহ উদ্রেককারী সকল প্রকার কাজ পরিত্যাগ করাকে *তাকওয়ার* দ্বিতীয়-পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইসলামী শরী'য়াতে এ ধরনের *তাকওয়া* সর্বাধিক পরিচিত। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ[৪১]

---

৩৬ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারণা* (ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো বাংলাবাজার, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ২২৪-২২৫।

৩৭ *তাফসীরুল বায়দাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৩৮ সূরাহ আল-ফাতাহঃ ২৬।

৩৯ *তাফসীরুল বায়দাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৪০ *আস-সুনানুল কুবরা*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; *সুনানু তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৮।

৪১ সূরাহ আল-'আরাফঃ ৯৬।

'আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের প্রতি আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'

৩. সন্দেহবিহীন হালাল বর্জন

হারাম বস্তু ও সন্দেহজনক হালাল বস্তু পরিত্যাগ করার পর অধিক সতর্কতার জন্য অনেক সন্দেহবিহীন হালাল বস্তুও বর্জন করা। কাযী আল-বায়দাবী বলেন, *তাকওয়ার* এ তৃতীয় পর্যায় বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য। এসব ব্যক্তিরা এমন কাজ থেকেও নিজেকে বিরত রাখে, যা আত্মাকে গাফেল করে। এ পর্যায়ের তাকওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ[৪২] 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত।'

৪. মুবাহ কাজ পরিত্যাগ

এমন কিছু মুবাহ কাজ পরিত্যাগ করা *তাকওয়ার* চতুর্থ স্তর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা অনেক সময় আল্লাহর 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এগুলো আসলে নিরর্থক কাজ। *তাকওয়া* অর্জনের জন্য এগুলো কাজও পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তাকওয়ার নির্যাস হলো এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সেগুলো হলো নিম্নরূপ:

* চক্ষুকে হারাম দেখা থেকে বিরত রাখা।
* হারাম আলোচনা হতে যবানকে বিরত রাখা।
* সকল হারাম আমল থেকে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে হেফাযতে রাখা।[৪৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু কর না।) তোমরা যখন রাসূল (সা.)-এর সাথে কথা বল তখন তোমরা উঁচু কণ্ঠে তাঁর সাথে কথা বল না এবং এমন আওয়াজে কথা বল না যে, তা নবীর (সা.) কণ্ঠস্বরকে অতিক্রম করে। কেননা সম্মানিত ব্যক্তির সামনে উঁচু স্বরে কথা বলা বেয়াদবীর নামান্তর। আর নিম্নস্বরে কথা বলা শিষ্টাচার ও ভদ্রতার লক্ষণ।[৪৪]

এ আয়াতের মাধ্যমে যারা রাসূল (সা.)-এর দরবারে উঠা বসা করতেন তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। যাতে রাসূল (সা.)-এর সাথে কথাবার্তা বলার সময় ঈমানদাররা সতর্কতা অবলম্বন করে। কারো কণ্ঠস্বর যেন তাঁর কণ্ঠ

---

[৪২] সূরাহ আলে-'ইমরান: ১০২।

[৪৩] *তানবীহুল গাফিলীন*, পৃ. ৩১৪।

[৪৪] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২১৯; *ফাতহুল কাদীর*, পৃ. ১৩৮৯।

থেকে উঁচু না হয়।[৪৫] তাঁকে একথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি যাঁর সাথে কথা বলছেন তিনি সাধারণ মানুষ নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহ্‌র প্রেরীত ও মনোনীত একজন রাসূল। সুতরাং তাঁর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর সাথে সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। যদি কথাবার্তা বলার সময় এ আদাব বা শিষ্টাচার রক্ষিত না হয়, তাহলে যিনি নবীর (সা.) চেয়ে উচ্চস্বরে কথা বলবেন তার 'আমলগুলো ধ্বংস ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ আদাব বা শিষ্টাচার শুধু নবীযুগের লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং সকল যুগেই এ নির্দেশের কার্যকারিতা বহাল থাকবে। এ মর্মে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্থান, কাল, পাত্রভেদে নবীর (সা.) কথা আলোচনার সময় কী নীতি গ্রহণ করতে হবে এ আয়াতে সে ইংগিত পাওয়া যায়। কেউ তার বন্ধুদের সাথে কিংবা সাধারণ মানুষের সাথে যে ভাবে কথা বলে, সে যদি সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সাথে অনুরূপভাবে কথা বলে তাহলে এটিই প্রমাণিত হবে যে, তার মধ্যে কোন সম্মানবোধ নেই।[৪৬] এ আয়াতে কণ্ঠস্বরকে নবীর (সা.) কণ্ঠস্বরের চেয়ে সুউচ্চ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এই জন্য যে,

এক. নবী করীম (সা.)-এর হুকুম ছাড়া তাঁর সামনে কোন কথা না বলা। **দুই.** তাঁর সামনে এমন জোরে কথা না বলা যা ভদ্রতার পরিপন্থী, চাই তা বক্তৃতায় হোক অথবা অন্য কাউকে ডাকার ক্ষেত্রে হোক। **তিন.** তাঁকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করা এবং ভদ্রতা গ্রহণ করা অপরিহার্য। অন্যথায় 'আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।[৪৭]

রাসূল (সা.) ছিলেন নবীকুল শিরোমনি। তাই সাধারণ ব্যক্তির সাথে কথা বলা এবং তাঁর সাথে কথা বলার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا[৪৮]

'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মত মনে কর না।'

রাসূল (সা.)-এর প্রতি এ আদব-কায়দা, রীতিনীতি শুধুমাত্র তৎকালীন লোকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না; বরং তাঁর অবর্তমানে পরবর্তীকালে সকল মানুষের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য হবে। যখন তাঁর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে কিংবা তাঁর কথা শুনানো

---

[৪৫] শানকীতী, *আদওয়াউল বায়ান*, ৭ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৩৬৩।

[৪৬] *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৬৮-৬৯।

[৪৭] মুহাম্মদ আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, তাবি) পৃ. ৭৩; *তাফসীরু আবী স'উদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

[৪৮] সূরাহ্ নূর: ৬৩।

হবে অথবা হাদীস পাঠ করা হবে, তখনও কোন উচ্চবাচ্য ও জোরে কথাবার্তা না বলে নীরবে তা শুনতে হবে।[৪৯] এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুফাসসির আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী উল্লেখ করেছেন যে, 'রাসূল (সা.)কে তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তাঁর মুখ-নিসৃত বাণী তথা হাদীস তাঁর মৃত্যুর পর শ্রবণ করার ক্ষেত্রেও সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যখন তাঁর বাণী পঠিত হবে তখন প্রত্যেক উপস্থিতিকে উচ্চস্বরে কথা বলা অথবা অমনযোগী হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমনিভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মজলিসে কথাবার্তা শোনার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হতো। এ আয়াতে স্থান কাল পাত্রভেদে সকল যুগের সকল মানুষের জন্য রাসূল (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[৫০] 'যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা শুনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো।' আর রাসূলের বাণীও ওহীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরআনের মতোই তাঁর বাণীকে সম্মান করতে হবে।"[৫১]

উল্লিখিত আয়াত থেকে সামাজিক শিষ্টাচার, আদব-কায়দা এবং সমাজ জীবনে মানুষের সাথে আচার আচরণ ও ব্যবহারের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে ছোট বড় সকলের সাথে তার সম-আচরণ প্রযোজ্য নয়। যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা সম্মানিত ও মর্যাদাবান। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিৎ। চাল চলন, উঠা-বসা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে কণ্ঠস্বর উচ্চ যেন না হয় এবং তাদের কথা যাতে চাপা না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সভ্য মানুষের সম্মুখে উঁচু কণ্ঠস্বর ধৃষ্টতার পরিচয় বহন করে। আর ধৃষ্টতা ও অহংকার শিষ্টাচারকে বিনষ্ট করে। সামাজিক শিষ্টাচার মেনে চললে সামাজিক সম্প্রীতি বহাল থাকে। কেননা সম্মান ও শিষ্টাচারের অভাবে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। তাই সমাজের অগ্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা আবশ্যক।[৫২]

---

[৪৯] *আইসারুত তাফাসীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৬।

[৫০] সূরাহ্ আল-'আরাফ: ২০৪।

[৫১] আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, তাহকীক: মুহাম্মদ 'আব্দুল কাদির 'আতা (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ), পৃ. ১৪৬।

[৫২] মো: শাদী শরীফ, *সূরাতুল হুজুরাতে বর্ণিত সামাজিক বিধান ও আদর্শ সমাজ গঠনে তার ভূমিকা*, এম. এ. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খ্রী., পৃ. ৩২।

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

(এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে যে ভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সে রূপ উচ্চস্বরে কথা বল না।) তোমরা পরস্পর যেমন, ডাকাডাকি কর তদ্রূপ রাসূল (সা.)কে নাম ধরে উঁচু আওয়াজে ডেকো না; বরং শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে তাঁকে সম্বোধন কর। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে এমন সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, তিনি আল-কুরআনে কোন স্থানে তাঁকে يا محمد (হে মুহাম্মদ!) বলে সম্বোধন করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (হে বস্ত্রাবৃত), يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(হে চাদরাবৃত) أَيُّهَا الرَّسُولُ (হে নবী) أَيُّهَا النَّبِيُّ (হে রাসূল) সম্বোধন করেছেন। অন্য কোন নবী বা রাসূলকে এরূপ সম্মানের সাথে সম্বোধন করা হয়নি; বরং তাঁদেরকে নাম ধরে ডাকা হয়েছে। যেমন, وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ[৫৩](আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইব্রাহীম), وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ (আমি বললাম, হে আদম! তুমি বসবাস কর), يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়), يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي (হে মূসা! আমি তোমাকে মানুষের জন্য আমার রিসালাতের মাধ্যমে নবী হিসেবে মনোনীত করেছি), يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً (হে দাউদ! আমি তোমাকে খলীফা বানিয়েছি)إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যুদানকারী) ইত্যাদি।

এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তাফসীরকারগণ রাসূল (সা.)-এর রওযা মুবারকেও উঁচু স্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল 'আরাবী লিখেছেন যে, রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশার মতই তাঁর ওফাতের পর তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব।[৫৪] এ মর্মে 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أنه سمع صوت رجلين فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال أتدريان أين انتما ثم قال من اين انتما قالا من اهل الطائف فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما[৫৫]

'একদা তিনি মসজিদে নববীতে দু ব্যক্তির উঁচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা কি জান যে, তোমরা কোন স্থানে অবস্থান করছ? তোমরা কোথা থেকে

---

[৫৩] সূরাহ্ আস-সাফ্ফাত: ১০৪।

[৫৪] কাযী আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি), পৃ. ১৪৬।

[৫৫] সাইয়্যিদ কুত্ব, *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (বৈরূত: দারুশ শুরূক, তা.বি), পৃ. ৩৩৪০।

এসেছ? তারা দু'জন বলল, আমরা তায়িফের অধিবাসী। এবার 'উমার (রা.) বললেন, তোমরা যদি মদীনার অধিবাসী হতে তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম।'

উপরিউক্তি বর্ণনার প্রেক্ষিতে 'আলিমগণ মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মীয় মর্যাদায় অধিষ্টিত 'আলিম, ফকীহ্ ও ইসলামী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নবীগণের উত্তরাধিকারী, বিধায় তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের সাথে উত্তম শিষ্টাচার ও রীতি নীতি মেনে চলা ওয়াজিব। তাঁদের সামনে এমন উচ্চ স্বরে কথা বলা সমুচিত নয়, যা তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে এবং যাতে তারা মনঃকষ্ট পায়। সংগত কারণ ব্যতিরেকে 'আলিমদেরকে কষ্ট দেয়া ইসলামী শরী'য়াতের দৃষ্টিতে হারাম।[৫৬]

أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(যেন তোমাদের সমস্ত 'আমল নষ্ট হয়ে না যায়। অথচ তোমরা তা বুঝতেই পারবে না।) কথা বলার সময় নবীর (সা.) কণ্ঠস্বরের উপর স্বীয় কণ্ঠস্বর উঁচু করে কথা বলা নবীকে অবজ্ঞা করার শামিল। এতে তোমাদের 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা যেমন, পরস্পরের মধ্যে উঁচু কণ্ঠস্বরে চেঁচামেচি করে কথা বল তেমনি নবীর (সা.) সামনে উচু আওয়াজে কথা বলাই হল 'আমল নষ্ট হওয়ার কারণ।[৫৭] এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا[৫৮]

'তোমরা রাসূলের ডাককে তোমাদের পরস্পরের ডাকাডাকির মত মনে কর না।' এজন্য সাধারণ ব্যক্তির সাথে কথা এবং নবীর (সা.) সাথে কথা বলার সময় অথবা তাঁর সম্মুখে এমনভাবে কথা বলা যাবে না, যাতে রাসূলের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও ম্লান হয়ে যায়। এটি হবে শিষ্টাচার পরিপন্থী। এরূপ আচরণের ফলে আচরণকারীর 'আমলগুলো তার অজ্ঞাতসারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ হুশিয়ারী সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণের পর সাহাবীগণ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেদের 'আমল ধ্বংস হওয়ার ভয়ে প্রকম্পিত হন। আবূ বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সামনে আর কোনদিন উচ্চ স্বরে কথা বলব না। এখন থেকে আমি আমৃত্যু আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথা বলব। 'উমার (রা.) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী

---

[৫৬] *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৯২।

[৫৭] আবূল হাসান আল-ওয়াহিদী, *আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল'আযীয*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল শামিয়া, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ১০১৬।

[৫৮] সূরাহ্, নূর: ৬৩।

করীম (সা.)-এর সাথে এত নিম্নস্বরে কথা বলতেন যে, নবী করীম (সা.) কোন কোন সময় তা শুনতেও পেতেন না, পুনরায় জিজ্ঞেস করতেন।[৫৯]

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

(নিশ্চয় যারা, রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।) যারা রাসূল (সা.)-এর সাথে কথাবার্তা বলার সময় নিজের কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী করেছেন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের অন্তরে একনিষ্ঠভাবে তাকওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তাকওয়ার অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর তারা এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে তারাই তাকওয়াপরায়ণ হওয়ার কারণে রাসূল (সা.)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কেবল তাকওয়াধারীকে পরীক্ষা করেছেন, যেমনিভাবে আগুনের মাধ্যমে প্রকৃত স্বর্ণকে পরীক্ষা করা হয়। এরূপভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের অন্তরসমূহকে সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে পবিত্র করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও ক্ষমা। কারণ তারা আল্লাহ্ উপর পূর্ণভাবে ঈমান এনেছেন এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছেন।[৬০] যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন,

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا[৬১]

'যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাকে সাহায্য কর ও সম্মান প্রদর্শন কর এবং সকাল ও বিকেলে তাঁর (আল্লাহর) গুণকীর্তন কর।'

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উমার (রা.)-এর কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানার জন্য একটি চিঠি

---

[৫৯] *সহীহুল বুখারী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫৮; হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর, *তাফসীরু কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রোঃ মুয়াসসাসাতুল মুখতার, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ২০৫-২০৬; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৪৮; আল বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০; ইবনু 'আতিয়্যাহ আল- গারনাতী, *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, ৫ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, তাবি), পৃ ১৪৫; ছা'লাবী, আল-*জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮।

[৬০] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২২০।

[৬১] সূরাহ্ আল-ফাতহ্: ৯।

লেখা হয়েছিল, যে কোন গুণাহ্র কাজের প্রতি আসক্ত হয়েও তা করেনি। 'উমার (রা.) এ চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন, যারা খারাপ কাজের প্রতি আসক্ত হয়েও তা করে না তারাই হলো ঐ সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,[৬২]

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ[৬৩]

'তারাই হলো সেই সমস্ত লোক, আল্লাহ্ তা'য়ালা যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।'

অন্তরকে পরীক্ষা করার আরেক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের অন্তরসমূহকে তাকওয়ার জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে নমনীয়তার ভাব সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত যে কোন ধরনের বিধান মেনে নিতে দ্বিধা করে না। আগুন দ্বারা যেমন, স্বর্ণকে নিখাদ করা হয় তেমনি তাদের অন্তরকে যাবতীয় কলুষতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং আপদ বিপদের মাধ্যমে তাদের আস্থা ও অবিচলতাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। যাতে যেকোন মসীবতে ধৈর্যধারণে তাদের তাকওয়া প্রকাশিত হয়।[৬৪] এ প্রসঙ্গে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করেছেন-এর অর্থ হলো, তাদের অন্তর থেকে তিনি কু-প্রবৃত্তি মিটিয়ে দিয়েছেন।[৬৫] সুতরাং এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, অন্তরকে পরীক্ষা করার অর্থ হলো, পরিশুদ্ধ করা। যেমন, স্বর্ণকে আগুন দ্বারা পরিশুদ্ধ ও নিখাদ করা হয়ে থাকে।[৬৬]

আয়াতটি অবতীর্ণের পটভূমি থেকে জানা যায় যে, ছাবিত ইবন কায়স (রা.) রাসূল (সা.)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলার কারণে আয়াতটি নাযিল হয়। তিনি তার এ কৃতকর্মের জন্য এমন অনুতপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি কয়েকদিন ঘর থেকেই বের

---

[৬২] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছুর*, ৭ম খণ্ড, (বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি), পৃ. ৫৫২; *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৬।

[৬৩] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ৩।

[৬৪] *আল-জাওয়াহিরুল হিসান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮।

[৬৫] *আল-মুহাররারুল ওযাজীয*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫; *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৬; *আদ-দুররুল মানছুর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯।

[৬৬] *আল-জাওয়াহিরুল হিসান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮-২৬৯; *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৬; *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৭; আল-কাসিমী, *মাহাসিনুত তা'বীল*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রী.), পৃ. ৪২০।

হননি। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও যেন তার নিকট তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। রাসূল (সা.) তার অনুশোচনার কথা জানতে পেরে তাকে বলেছিলেন,

إمش في الأرض بسطا فإنك من أهل الجنة أما ترضى ان تعيش حميدا وتموت شهيدا[৬৭]

'হে ছাবিত! তুমি ভূ-পৃষ্ঠে বুক ফুলিয়ে চল। নিশ্চয় তুমি জান্নাতী। তুমি কি প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন করতে এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে সন্তুষ্ট নও?' হযরত আনাস (রা.) বলতেন, আমরা আমাদের সামনে এ জান্নাতী পুরুষকে চলতে ফিরতে দেখতাম। আর ভাবতাম কি সৌভাগ্যবান এ লোকটি। যার তাকওয়ার জন্য স্বয়ং রাসূল (সা.) তাঁকে জীবিত জান্নাতী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা দেন এবং বলেন, তুমি প্রশংসনীয় জীবন যাপন করবে এবং শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করবে ও জান্নাতে চলে যাবে। ছাবিতের জীবনে তা-ই ঘটেছিল। খলীফা আবূ বকরের (রা.) খিলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়। হযরত ছাবিত (রা.) এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমদিকে যুদ্ধের ময়দানে ছাবিত যখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা পরাজয়ের ভাব লক্ষ্য করলেন তখন তিনি হুযায়ফার (রা.) মুক্ত গোলাম সালিমকে বললেন, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আমরা শত্রুদের সাথে এরূপ যুদ্ধ করতাম না। একথা বলেই তারা দুজন দৃঢ় অবস্থান নিলেন। এরপর তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ছাবিত (রা.) শাহাদাত বরণ করলেন, তখন তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। মৃত্যুর পর কোন এক সাহাবী তাঁকে স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে তিনি ঐ সাহাবীকে বললেন, আমার বর্মটি জনৈক মুসলমান আমার শরীর থেকে খুলে সৈন্যদের এক পার্শ্বে রেখেছে, সেখানে একটি ঘোড়া রশি দিয়ে বাঁধা আছে। আর আমার বর্মের উপর সে পাথরের একটি হাড়ি রেখে দিয়েছে। তুমি খালিদ ইবন ওয়ালীদকে বলবে যে, তিনি যেন আমার এ বর্ম ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে ফেরত নেন। আর খলীফা আবূ বকরের (রা.) নিকট গিয়ে বলবে, আমার কিছু ঋণ আছে, তা যেন পরিশোধ করা হয় এবং আমার অমুক গোলামকে যেন মুক্ত করে দেয়া হয়। ঐ সাহাবী খালিদের (রা.) কাছে গিয়ে এ কথা বললেন। এরপর খালিদ (রা.) খলীফা আবূ বকরের (রা.) নিকট এরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি ছাবিতের এ অসিয়ত পূরণ করেন। আনাস (রা.) বলেন, স্বপ্নেদৃষ্ট এ অসিয়ত ছাড়া অন্য কারো কোন অসিয়ত পূরণ করা হয়েছে কি-না তা আমার জানা নেই।[৬৮]

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

---

[৬৭] আল-হাকেম, *আল-মুসতাদরাক*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৭।

[৬৮] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২২; কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৮৯।

(যারা ঘরের বাহির থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।) মক্কা বিজয়ের পর হিজরী অষ্টম সালে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূল (সা.)-এর নিকট আগমন করতে থাকে। এ সময় তামীম গোত্রের এক প্রতিনিধি দল দুপুরে রাসূল (সা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য মদীনায় আগমন করে। তারা ছিল সত্তর জন। এ দলে কিছু লোক নির্বোধ ছিল। এ সময় রাসূল (সা.) কোন এক হুজুরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা হুজুরার পেছন থেকে *"হে মুহাম্মদ! আমাদের নিকট বেরিয়ে আসুন"* বলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে।[৬৯] রাসূল (সা.)কে এরূপ অমার্জিত ভাষায় ডাকাডাকি করার কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ আয়াতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এদের অধিকাংশ লোকই নির্বোধ ও মূর্খ। এরা আদব শিষ্টাচার বুঝে না, ভদ্র ভাষায় কথা বলতে জানে না। কোন কোন সময় أَكْثَرُهُمْ অধিকাংশ না বুঝিয়ে সকলকে বুঝানো হয়। আরবরা أكثر উল্লেখ করে الكل। তথা সকলকে বুঝিয়ে থাকে।[৭০]

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(আপনার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধারণ করত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।) তারা যদি রাসূল (সা.)কে অমার্জিত ভাষায় ডাকাডাকি না করে ভদ্রভাবে বসে থাকত, তারপর রাসূল (সা.) স্বল্প বিশ্রামের পর তাদের নিকট আসলে তারা যদি তাঁর সাথে কথা বলত, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। এতে কোন বেয়াদবীও হত না; বরং রাসূল (সা.)কে সম্মান প্রদর্শন করা হত। এরূপ আচরণের জন্য তারা প্রশংসিত হতো এবং ছওয়াবের অধিকারীও হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হওয়ার কারণে তিনি তাদেরকে কোন শাস্তি না দিয়ে শুধু নসীহত করেছেন এবং রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা এবং অশিষ্ট আচরণ করার জন্য তাদেরকে কেবল সতর্ক করে দিয়েছেন। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশিষ্ট লোকেরা নির্বোধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।[৭১]

শর'ঈ আহকাম

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ আয়াতের শানে নুযূল থেকে শরী'য়তের একটি মাস'আলা প্রতিভাত হয়, তাহলো কুরবানীর দিনে 'ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ কী? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম আহমাদের (রহ.) মতে, ইমামের সালামের পূর্বে কুরবানী করা বৈধ নয়। ইমাম

---

[৬৯] আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯।

[৭০] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২২১।

[৭১] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১১।

শাফি'ঈর (রহ.) মতে, কুরবানীর দিন সূর্যোদয়ের পর যখন এতটুকু সময় অতিবাহিত হবে যে, ইমাম সালাত ও উভয় খুতবাহ্ শেষ করতে পারেন কেবল তখনই কুরবানী করা বৈধ। চাই ইমাম সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করে থাকুন বা আদায় না করে থাকুন। হযরত 'আতা বলেন, সূর্যোদয়ের পর থেকে কুরবানী করার সময় শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইমামের সালাত আদায় বা তাঁর খুতবাহ্ শেষ হওয়ার বিষয়টি এর আওতাভূক্ত নয়।[৭২]

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) অপর এক মত অনুযায়ী গ্রামে 'ঈদের জামা'য়াত কায়েম না থাকলে সেখানে সুবহে সাদিকের পর কুরবানী করা বৈধ। অন্য তিন ইমাম এ উক্তির বিপরীত মতপোষণ করেন। ইমাম সাহেবের একথার পেছনে দলীল হলো, কুরবানীকে সালাতের পর স্থান দেয়া হয়েছে এজন্য যে, যদি সালাতের পূর্বে কুরবানী করা হয় তাহলে কুরবানী করা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সালাতর প্রতি অমনোযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য কুরবানী বিলম্ব করার কোন যৌক্তিকতা নেই।[৭৩]

আজকের গ্রামগুলোকে আগের যুগের গ্রামের সাথে তুলনা করা যাবে না। আজ অধিকাংশ গ্রামগুলো শহরতলীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে এখানে যথারীতিভাবে 'ঈদের জামায়াত গড়ে উঠেছে। তাই 'ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করে এ নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুণ নামাযে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে নামাযের পর সকলেই মিলে কুরবানী করা যুক্তিযুক্ত। এর সমর্থনে হযরত বারা ইবন 'আযিব থেকে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.[৭৪]

'কুরবানীর দিন রাসূল (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবাহ্ দিলেন। তিনি বললেন, আজকের দিনে আমরা সর্বপ্রথম সালাত আদায় করব। এরপর ফিরে এসে কুরবানী করব। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করবে তার এটি কুরবানী নয়; বরং এটি সাধারণ গোশত হিসেবে বিবেচিত হবে যা সে পরিবারের লোকদের জন্য পূর্বেই দ্রুত সংগ্রহ করে নিল। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

---

[৭২] কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড (দীওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো, তাবি), পৃ. ৬।

[৭৩] *প্রাগুক্ত*।

[৭৪] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল 'ঈদাইন, বাব: আল-খুতবাতু বা'দাল 'ঈদ, হাদীস নং- ৯৬৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ঈদাইন, হাদীস নং- ১৯৬১।

পরিবেশিত সকল সংবাদ যাচাই করা ওয়াজিব

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۞ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۞ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

অনুবাদ

৬. হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ পরিবেশন করে, তোমরা তা যাচাই কর, যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

৭. তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি তোমাদের অনেক বিষয় মেনে নেন, তাহলে তোমরা কষ্ট পাবে কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং একে তোমাদের অন্তরে হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার এবং নাফরমানীর প্রতি তিনি তোমাদের ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

৮. এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃপা ও নি'য়ামত। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَاسِقٌ শব্দটি فسق শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো, বহির্গমন। আর পরিভাষায়-দ্বীনের সীমারেখা থেকে বহির্গমন ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়। بِنَبَإٍ খবর, সংবাদ। فَتَبَيَّنُوا তোমরা যাচাই কর। أَن تُصِيبُوا قَوْمًا কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। فَتُصْبِحُوا তোমরা হয়ে যাবে , পরিণত হবে। عَلَى مَا فَعَلْتُمْ তোমাদের ভুল কৃতকর্ম অথবা সিদ্ধান্তের কারণে نَادِمِينَ লজ্জিত।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে রাসূল রয়েছেন। তোমরা মিথ্যা কথা বলো না। সুতরাং আল্লাহ তাঁকে তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন। لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ যদি তিনি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করতেন যা বাস্তবতার বিপরীত। لَعَنِتُّمْ তাহলে তোমরা কষ্ট পেতে وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ তবে আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে পছন্দনীয় করেছেন। وَزَيَّنَهُ তা হৃদয়গ্রাহী করেছেন فِي قُلُوبِكُمْ তোমাদের অন্তরসমূহে। وَكَرَّهَ তিনি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন الْكُفْرَ কুফরীকে। কুফর শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো,

ঢাকা বা আচ্ছাদিত করা। এটি যেহেতু ঈমানকে ঢেকে ফেলে সেজন্য একে কুফর বলা হয়। الْعِصْيَانَ-এর অর্থ হলো, নাফরমানী, বিরুদ্ধাচারণ ইত্যাদি। الرَّاشِدُونَ। সঠিক পথগামী, দ্বীনের প্রতি অবিচল আস্থাশীল। শব্দটি رشد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, সত্যের পথযাত্রী এবং দৃঢ়তার পথ অনুসরণকারী। فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও নি'য়ামতের কারণে তারা সঠিক পথগামী' বাক্যটি حبب এবং كره-এর 'ইল্লাত বা কারণ বর্ণনাকারী। অর্থাৎ আল্লাহর ভালবাসা এবং সঠিকপথ অনুসরণ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুকম্পা ও অনুগ্রহ।

শানে নুযূল

ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতটি আল-ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ্ ইবন আবী মু'ঈত সম্পর্কে নাযিল হয়। রাসূল (সা.) তাঁকে বনী মুস্তালিকের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। মুস্তালিক গোত্রের নিকট যাকাত আদায়কারী হিসেবে রাসূল (সা.) কর্তৃক তাঁকে প্রেরণের খবর পৌঁছলে তখন তারা ওয়ালীদকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে। এতে ওয়ালীদ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কেননা জাহিলী যুগে তাঁর ও বানূ মুস্তালিকের মধ্যে শত্রুতা ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাস্তা থেকে ফিরে এসে রাসূল (সা.)কে জানান যে, তারা (বানূ মুস্তালিক) যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাসূল (সা.) ওয়ালীদ থেকে এ খবর শ্রবণে ভীষণ রাগন্বিত হন এবং এক পর্যায়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে মনস্থ করেন। ইত্যবসরে বানূ মুস্তালিকের এক প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সংবাদ পেলাম যে, আমাদের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য আপনার প্রেরিত 'আমিল অর্ধেক রাস্তা থেকে ফিরে এসেছেন। আমরা আশঙ্কা করছি, হয়তোবা আপনি আমাদের উপর রাগন্বিত হয়েছেন এবং তাকে ফিরে আসতে বলেছেন। আমরা এজন্য আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাচ্ছি। তাদের এ কথা শুনে রাসূল (সা.) ওয়ালীদের ফিরে আসার বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তখন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

---

[১] আহমদ মুস্তাফা আল-মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি/১৯৯৮ খ্রী:), পৃ.২৪১-২৪২; *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২২৬; আবূল লায়ছ সমরকান্দী, *বাহরুল উলূম*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত:দারুল কুতুব আল-'ইলামিয়্যাহ, ১৪১৩ হি/১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ২৬২; ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, ১৪শ খণ্ড (বৈরূত:

এ ঘটনার পর রাসূল (সা.) তাদের নিকট খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে (রা.) এ নির্দেশ দিয়ে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন,

انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل فى الكفار ففعل ذلك خالد.[২]

'তুমি তাদেরকে ভালকরে পর্যবেক্ষণ করবে। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে ঈমানের প্রমাণ পাও, তাহলে তাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে নিবে। আর যদি তাদের মধ্যে ঈমানে ছোঁয়া দেখতে না পাও, তাহলে তাদের সাথে এমন ব্যবহার করবে যেমনটি কাফিরদের সাথে করে থাকো। খালিদ এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন।' তিনি (খালিদ) তাদের কাছে নীত হয়ে তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতিফলন এবং আনুগত্যের মনোভাব দেখতে পেলেন। অতঃপর তারা তাঁর নিকট যাকাত প্রত্যর্পণ করলেন। খালিদ যাকাত নিয়ে পুনরায় মদীনায় ফিরে আসলেন।[৩]

তাফসীর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

(হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ পরিবেশন করে, তোমরা তা যাচাই কর।)

আয়াতে উল্লিখিত فَاسِقٌ শব্দের অর্থ হলো, বের হওয়া। যেমন, আরবরা বলে থাকে, فسق الرطب عن قشره 'খেজুর তার বাকল থেকে বেরিয়ে এসেছে'।[৪] আর শরী'য়াতের পরিভাষায়-

---

দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি/১৯৯৫ খ্রী.), পৃ. ১২০; ইবন 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এই রিওয়ায়াত ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বর্ণনা করেছেন এভাবে.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق ليأخذ الصدقات فلما أتاهم الخبر فراحوا به وخرجوا يستقبلونه فلما حدث بذلك الوليد حسب انهم جاءوا لقتاله فرجع أن يدركوه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم منعوا الزكاة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إناخشينا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أنه إنما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا وانا نعوذ بالله من غضبه و غضب رسوله فأنزل الله عذرهم فى الكتاب فقال (يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ)

দ্রষ্টব্য, ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

২ *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৮; *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০২।

৩ আহমাদ মোল্লা জীউন, *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ* (পেশাওয়ার মাকতাবায়ে হক্কানিয়্যাহ্ তাবি), পৃ. ৬৭১।

৪ *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০২; মুহাম্মদ সাইয়েদ তানতাবী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত*, ১৩শ খণ্ড (কায়রো: দারুস সা'আদাহ্, তাবি) পৃ. ৩০৪।

الفسق هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة

'কবীরা গুনাহ্ অথবা বার বার ছগীরা গুনাহ্ করাকে ফিসক বলা হয়।'[৫]

আহমাদ মুস্তাফা আল-মারাগীর মতে, الخارج عن حدود الدين هو 'দ্বীনের পরিবৃত্ত থেকে নির্গমনকারীকে ফাসিক বলা হয়।'[৬] 'আল্লামা যামাখশারী ফাসিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে,[৭]

الفسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة و هو النازل بين المنزلتين أى بين منزلة المؤمن والكافر و قالوا إن أوّل من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء وعن أشياعه وكونه بين بين أن حكمه حكم المؤمن فى أنه يناكح ويوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين و هو كالكافر فى الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل له شهادة ومذهب ملك بن أنس والزيدية أن الصلاة لاتجزى خلفه ويقال للخلفاء المردة من الكفار الفسقة وقد جاء الاستعملان فى كتاب الله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يريد اللمز و التنابز إن المنافقين هم الفاسقون.

'শরী'য়াতের পরিভাষায়, কবীরা গুনাহ্ করার কারণে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের সীমারেখা থেকে বহির্গমন করেছে তাকে ফাসিক বলা হয়। সে দু'টি স্থানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী অর্থাৎ কাফির ও মুমিনের মধ্যবর্তী স্থান। 'আলিমগণ বলেছেন, সর্বপ্রথম ফাসিকের এই স্থান নির্ধারণ করেছেন আবূ হুযায়ফাহ্ ওয়াসিল ইবন 'আতা ও তার সহচরগণ। ফাসিকের হুক্‌ম হলো মুমিনের ন্যায়। সে অন্যান্য মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে, সে অংশীদার হতে পারবে, মৃত্যুর পর গোসল দিয়ে জানাযা পড়ে তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে। সম্পর্কচ্ছেদ, ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত দেয়ার ক্ষেত্রে ফাসিক ব্যক্তি কাফিরের মতই। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম মালিক ও যায়দিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতে, ফাসিকের পেছনে সালাত আদায় বৈধ নয়। অসাধু দুরাচার কাফির খলীফাদেরকে ফাসিক বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর কিতাবে ফাসিক শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্

---

[৫] আস-সাখাভী, *ফাতহুল মাজীদ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ ১৪১৩ হি/১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ৩১৫।

[৬] *তাফসীরুল মারাগী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪১;

[৭] আয-যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ.৮৫।

বলেন,[৮] بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ অর্থাৎ ঈমানের পর মন্দ নাম অতিমন্দ। এর দ্বারা অপরকে দোষারোপ করা, অপরকে মন্দনামে ডাকা বুঝানো হয়েছে। আর মুনাফিকরা হলো ফাসিক।'

শর'ঈ পরিভাষায় শরী'য়াতের বিধি-বিধান থেকে বাইরে অবস্থানকারী বক্তিকে ফাসিক বলা হয়।[৯] শব্দটি ব্যবহারের বিভিন্নতায় কখনো কাফিরকে ফাসিক বলা হয়ে থাকে। কেননা সে তো ঈমান থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আল-কুরআনে ফাসিক (فاسق) শব্দকে কাফির অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়। আবার কখনো কবীরা গুনাহ্ কারীকে ফাসিক বলা হয়।[১০] কখনো তাওবা না করে কবীরা গুনাহ্ এর উপর অটল ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ্কে উক্ত সংবাদ পরিবেশনকারী বলা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন একজন সাহাবী। এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের পূর্বে তাঁর থেকে কোন ফাসিকী প্রকাশ পায়নি। তার এই মিথ্যাচার বানূ মুস্তালিক সম্পর্কে তার ভুল ধারণা ও সন্দেহের উপর নির্ভরশীল ছিল।[১১] উল্লেখ্য যে, ইসলামের পূর্বে তারা তার শত্রু ছিল। সুতরাং এ আয়াতে فاسق দ্বারা সম্ভবত এমন লোককে বুঝানো হয়েছে, কখনো যার সততা ও ন্যায় পরায়ণতা প্রকাশ পায়নি।[১২] তাই আয়াতটি ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ্র ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হলেও এর হুকম সর্বজনীন। এজন্যই আয়াতে فاسق শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ্কে ফাসিক বলা যাবে না। কারণ তিনি অনুমান করে বানূ মুস্তালিক সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর নিকট সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নয়। এবিষয়ে তাঁর কিছুটা ভ্রম হয়েছিল। আর ভ্রমকারী ফাসিক হতে পারে না। এদিক দৃষ্টি রেখে হাসান বাসরী বলেছেন,

فو الله لئن كانت نزلت فى هؤلاء القوم خاصة أنها لمرسلة إلى القيامة ما نسخها شئ[১৩]

---

[৮] সূরাহ আল-হুজুরাত: ১১।

[৯] আইমান আব্দুল আযীয জাবর, *রাওয়ায়িউল বায়ান লি মা'আনিল কুরআন* (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ১৯৯৭ খ্রী.), সূরাহ হুজুরাত অংশ।

[১০] *আইসারুত তাফাসীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।

[১১] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩; মুহাম্মদ ইযযাহ্ দারওয়াযাহ্, *আত-তাফসীরুল হাদীস*, ৮ম খণ্ড (কায়রো: দারুল মাগরিব, তাবি), পৃ. ৫০২।

[১২] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৩।

[১৩] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬ খণ্ড, পৃ. ২২৬।

'যদিও আয়াতটি এ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি এর হুক্‌ম কিয়ামত পর্যন্ত সর্বজনীন হিসেবে বলবৎ থাকবে। এ আয়াতকে কোন কিছুই মানসূখ করেনি।'

এ আয়াতে فاسق এবং نبأ শব্দ দু'টিকে نكره তথা অনির্দিষ্ট রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, যে-কোন সংবাদ পরিবেশনকারী এবং প্রাপ্ত যে কোন ধরনের সংবাদ তা যাচাই করা অতীব প্রয়োজন।[১৪]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে কোন পরিবেশিত সংবাদে তদন্ত সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী ব্যক্তি, সমাজ ও সংগঠনের কাছে কোন সংবাদ আসলে তা গ্রহণ ও বর্জনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এটি ঈমানী দায়িত্ব। কোন ব্যক্তি ও মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত খবর বা সংবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে এর উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যাচাই বাছাই ছাড়া প্রাপ্ত সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনাকাঙ্খিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হতে পারে। এতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সঙ্ঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, যা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্য অপরিণামদর্শী ফল ডেকে আনবে। এজন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা এ আয়াতে পরিবেশিত যে কোন ধরণের সংবাদ যাচাই বাছাই করার পাশাপাশি সংবাদদাতার নির্ভরযোগ্যতা বিশ্লেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সংবাদদাতা যদি ফাসিক তথা অসাধু ও দুরাচার হয়, যা তার বাহ্যিক আচার আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ থেকে বুঝা যায়, তাহলে তার দেয়া সংবাদ অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণের পূর্বে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা অনস্বীকার্য। কেননা দুষ্ট প্রকৃতির লোক অনেক সময় স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ও প্রচার করে থাকে। এজন্য এবিষয়ে অধিক সতর্কবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং আয়াত থেকে এটিই প্রতিভাত হয়েছে যে, যার চরিত্র ও কাজকর্ম নির্ভরযোগ্য নয়, যাচাই বাছাই ছাড়া এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা কোন জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ কোন ব্যক্তি বা ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ আয়াত থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে خبر واحد তথা একজনের পরিবেশিত সংবাদ গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি সংবাদদাতা 'আদিল বা ন্যায় পরায়ণ হন।[১৫]

---

[১৪] *প্রাগুক্ত*, ২২৮; *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ*, পৃ. ৬৭১।

[১৫] *আন নুকাত ওয়াল 'উয়ূন*, ৫০ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ*, পৃ. ৬৭২; রূহুল মা'আনী, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪।

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

(তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে।)

তোমাদের মাঝে যেহেতু স্বয়ং রাসূল অবস্থান করছেন সেহেতু তোমরা তাকে উপেক্ষা করে অগ্রগামী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যেয়ো না। তোমরা তাঁকে সম্মান কর, তাঁর আনুগত্য কর। কেননা তোমাদের জন্য যেটি কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক তা তিনি জানেন এবং তিনি তোমাদেরকে বেশী ভালো জানেন। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেছেন,[১৬] النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ 'নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট।' সুতরাং নবীর সিদ্ধান্তই মু'মিনদের জন্য অধিক ফলপ্রদ ও উপকারী।

সাহাবীগণ যেহেতু ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ্‌র কাছে বানূ মুস্তালিকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার খবর শুনেছিলেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, সেহেতু তাঁরা বানূ মুস্তালিকের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিতে চেয়েছিলেন। এ জন্যই এ আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) যদি তোমাদের ক্ষুব্ধ হওয়াকে আমলে নিতেন এবং বানূ মুস্তালিকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তাহলে এটি এক অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্ম দিত। এতে তারা যেমন, ক্ষতিগ্রস্থ হত, তেমনি তোমরাও কষ্ট পেতে। এ কথাটিই অন্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে,

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ[১৭]

'আর সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করত, তাহলে আসমান যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে বিমুখ।'

সাহাবীগণের এই ক্ষোভ ছিল আল্লাহর দ্বীনের জন্যই, পার্থিব কোন স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ছিল না। এজন্য তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং তাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে এবং তাদের ক্ষুব্ধতা যে সঠিক নয়

---

[১৬] সূরাহ্ আল-আহযাব: ৭১

[১৭] সূরাহ আল-মু'মিনুন: ৭।

তা তাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করানো হয়েছে। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত পাঠ করা হলো, তখন রাসূল (সা.) বললেন,

هَذَا نَبِيُّكُمْ يَوْحى اِلَيْهِ و خِيَارُ اَئِمَتِّكُمْ لَوْ اَطَاعَهُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الاَمْرِ لَعَنَتُوْا فَكَيْفَ بِكُمُ الْيَوْمَ[১৮]

'ইনিই তোমাদের নবী, যার কাছে অহী প্রেরীত হয়। এনিই তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট নেতা। তিনি যদি তোমাদের বেশীরভাগ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে। আর আজকে তোমাদের কি অবস্থা হত? (যদি তিনি তোমাদের ক্ষুব্ধতার কারণে বানূ মুস্তালিকের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।)'

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

(কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং একে তোমাদের জন্য হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়।)

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফিস্‌ক فسق-এর স্তর عصيان থেকে উঁচু এবং (كفر) থেকে নীচু। কুফ্‌র (كفر) খুবই খারাপ জিনিস। তার চেয়ে কম খারাপ হচ্ছে فسق এবং এর চেয়ে কম খারাপ عصيان। তখন ফিসক (فسق)-এর অর্থ হবে দল থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং বিদ'আতী 'আকীদা অবলম্বন করা; কিন্তু এরূপ 'আকীদাগত বিদ'আত হওয়া সত্ত্বেও কুফরের সীমা পর্যন্ত না পৌঁছা। আর তখন عصيان-এর অর্থ হবে, কর্মগত গুনাহ্ এবং দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাফরমানী।[১৯] উল্লেখ্য যে, পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য তিনটি বিষয় স্বীকৃত। যেমন, মৌখিক স্বীকারোক্তি (إقرار باللسان) অন্তরে বিশ্বাস (تصديق بالجنان) এবং কর্মে তার বাস্তবায়ন (عمل بالأركان)। এ তিনটির বিপরীতধর্মী বিষয় হিসেবে কুফর (كفر) ফিসক (فسق) ও ইসইয়ানকে (عصيان) উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের অন্তরকে করেছেন সুষমামন্ডিত। আর তিনি تصديق بالجنان দ্বারা তোমাদের অন্তরকে

---

[১৮] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান* (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.) আবওয়াবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৩২৬৯, পৃ. ৭৪৩; আস-সুয়ূতী, *আদ দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮৯; *বাহরুল উলূম* ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

[১৯] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩; মুহাম্মদ 'আলী সায়েস বলেন, ويرى بعضهم أن الكفر والشرك والفسوق كبيرة والعصيان صغيرة দ্রষ্টব্য: *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৫।

হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এরপর তিনি বান্দার জন্য মিথ্যা এবং ফিস্‌ককে অপছন্দ করেছেন এবং এর পরিবর্তে মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্যকে পছন্দ করেছেন। আর العمل بالأركان-এর মাধ্যমে নাফরমানীর (العصيان) পরিবর্তে নেক 'আমল ও সৎ কাজ করাকে তিনি তোমাদের জন্য প্রিয় বস্তুতে পরিণত করেছেন।[২০] তাই অন্তরের বিশ্বাস হলো ঈমান। সৎ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর পরিস্ফুটন ঘটানোই হলো ইসলাম। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ قَالَ ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا[২১]

"ইসলাম প্রকাশ্য বিষয়, আর ঈমান হলো অন্তরের বিষয়। এরপর রাসূল (সা.) স্বীয় হস্তদ্বারা বক্ষের দিকে ইংগিত করে তিনবার বললেন এখানেই রয়েছে তাকওয়া, এখানেই রয়েছে তাকওয়া, এখানেই রয়েছে তাকওয়া।"

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতটির সামগ্রিক অর্থ হলো, তোমরা যে চিন্তাভাবনা ও তদন্ত করনি, তা তিরস্কার যোগ্য নয়। কেননা, তোমরা কুফরকে ঘৃণা কর এবং ঈমানকে ভালোবাস। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফর ও ফিস্‌কের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে ঈমানকেই তিনি তোমাদের জন্য গ্রহণ করেছেন।

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ **(তারাই সৎপথ অবলম্বন কারী।)** অর্থাৎ এরূপ লোকেরাই হলো কেবল হিদায়াত প্রাপ্ত। তারাই এ প্রশংসার দাবিদার। এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে যে, প্রকৃত মু'মিন সে কুফর, ফিস্‌ক ও নাফরমানীকে পছন্দ করে না। কখনো সে এগুলোর ধারে পাশে যায় না।

فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(এটি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।) অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য ঈমানকে পছন্দ করেছেন এবং কুফরকে অপ্রিয় করেছেন, এটি

---

২০ আল-খাযিন, *লুবাবুত তা'বীল ফী মা'আনীত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রী.), পৃ. ১৭৮; *তাফসীর আল-মারাগী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

২১ হাফিয ইবন কাছীর, *তাফসীরু কুরআনিল* 'আযীম', ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: মুওয়াসাসাতুল মুখতার, ১৪২৩ হি/২০০২ খ্রী.), পৃ.২০৮-২০৯।

তোমাদের জন্য তাঁর সানুগ্রহ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলছেন, "তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যেই রাসূল রয়েছেন। আল্লাহর কসম! তোমরা এখনো মতামত ব্যক্ত করার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে পারনি। সুতরাং ব্যক্তি সর্বাগ্রে নিজেকেই অভিযুক্ত মনে করবে এবং আল্লাহর কিতাব থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।[২২]

শর'ঈ আহকাম

পূর্বে আলোচিত এ তিনটি (৬-৮) আয়াত থেকে শরী'য়াতের যে সমস্ত বিধান উদ্ভাবিত হয় সেগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. প্রাপ্ত সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করে ধীরস্থির ও সর্তকতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সত্যতা যাচাই ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। দৃঢ়তা, পর্যবেক্ষণ এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তাড়াহুড়া না করে সকল কাজের সিদ্ধান্ত নেয়াই যুক্তিসম্মত। রাসূল (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,[২৩]

التثبت من الله والخجلة من الشيطان

---

[২২] মূল আরবী: أنتم والله أسخف رأيا وأطيش أحلاما فليهتم نفسه ولينتصح كتاب الله تعالى
দ্রষ্টব্য: *তাফসীর আল-তাবারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৬; *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৪।

[২৩] আল-বায়হাকী, *আস-সুনান*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৪; আবূ ইয়া'লা, *আস-সুনান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭-২৪৮; আল-হায়ছামী, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২২; হায়ছামী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। বর্ণনাকারীগণের মধ্যে সা'দ ইবন সিনান নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন তাঁর নাম নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, তাঁর নাম হলো সিনান ইবন সা'দ তবে বর্ণনাকারী যদি সিনান ইবন সা'দ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি একজন ছিকাহ্ বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে সা'দ ইবন সিনান এবং সা'ঈদ ইবন সিনানের বর্ণনা *মুনকার* হিসেবে গণ্য হবে। আবূ 'উবায়দ আল-আজরী বলেন, আমি ইমাম আবূ দাউদকে সিনান ইবন সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন, ইমাম আহমাদ তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবন সালিহ্‌কে বললাম, সিনান ইবন সা'দ আনাস (রা.) থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন কি? এতে তিনি রাগন্বিত হলেন। দ্রষ্টব্য: আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ৫ম খণ্ড, তাহকীক; আশ-শায়খ 'আলী মুহাম্মদ মুওয়াব্বাস, শায়খ 'আদিল 'আব্দুল মওজূদ (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪১৮ হি/১৯৯৭ খ্রী.), পাদটিকা অংশ, পৃ. ২৭০।

"দৃঢ়তা ও ধীরস্থিতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।'

২. এ আয়াত থেকে ইসলামী শরী'য়তের বিধি-বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উদ্ভাবিত হয়েছে। তাহলো একজনের সংবাদ (خبر الواحد) দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা রাসূল (সা.) খালিদ ইবন ওয়ালীদকে বানূ মুস্তালিক সম্পর্কিত ওয়ালীদ ইবন 'উকবার খবর তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর খালিদ একা তদন্ত করার জন্য বানূ মুস্তালিকের নিকট গিয়েছিলেন এবং সত্য সংবাদটি রাসূল (সা.)-এর নিকট পরিবেশন করেছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর সংবাদ বিশ্বাস করলেন এবং গ্রহণ করলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একজনের সংবাদ (خبر الواحد) দলীল হিসেবে গ্রহণীয়। যদি তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য না হত তাহলে রাসূল (সা.) খালিদ ইবন ওয়ালীদের খবর গ্রহণ করতেন না। অপরদিকে সংবাদদাতা যদি ফাসিক হয় এবং কোন বিষয়ে তার ফাসিকী যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে তার সংবাদ ইজমা'র ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য হবেনা।[২৪]

৩. কতিপয় 'আলিম এ আয়াতের ভিত্তিতে ফাসিক ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদাতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদি সে (ফাসিক ব্যক্তি) সাক্ষ্যদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে আয়াতে فتبينوا-এর বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত মুফাসসির মাহমূদ আল-আলূসী বলেন, হানাফীদের মতে ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও ফাসিক ব্যক্তি সাক্ষ্যদাতাদের অর্ন্তভুক্ত। বিচারক যদি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে বিচার কার্য সম্পন্ন করেন তাহলে বিচার সঙ্ঘটিত হবে কিন্তু বিচারক গুনাহ্গার হবেন।[২৫] তবে বিবাহের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য অভিভাবকত্বের পর্যায়ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। ফাসিকের যদি অভিভাবক হওয়া শুদ্ধ হয় তাহলে বিবাহের সাক্ষী হওয়াও তার জন্য শুদ্ধ হবে। বিবাহে তার সাক্ষী হওয়ার অর্থ হলো, সে 'আকদ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একজন দূতের ভূমিকা পালন করবে। অত্যাবশ্যকীয় কোন বিষয়ে নয়। আর বিবাহে সাক্ষ্য দ্বারা অত্যাবশ্যকীয় কোন

---

[২৪] *তাফসীরুল কাবীর*, ১৪ খণ্ড, পৃ. ১২১; *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬ খণ্ড, পৃ. ২৩০; মাহমূদ ইবন হামযাহ্ আল-কিরমানী, *গারাইবুত তাফসীর*, ২য় খণ্ড (সৌদী আরবঃ মুওয়াস্সাসাতুল কিবলাহ্, ১৯৮৮ খ্রী.), পৃ. ১১২২।

[২৫] আল-জাস্সাস, *আহকামুল কুরআন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৮; *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ্*, পৃ. ৬৭২; *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪-২০৫।

বিষয় অর্জিত হয় না; বরং 'আকদ সম্পন্নকারীদ্বয়ের মাধ্যমে (স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে) আবশ্যকীয় বিষয় অর্জিত হয়ে থাকে।[২৬]

৪. কোনো 'আলিম কোনো কোনো সাহাবীর 'আদালতের ব্যাপারে নেতিবাচক মত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, এ আয়াতে সাহাবী ওয়ালীদ ইবন 'উকবার ব্যাপারে فاسق শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে তাঁর 'আদালতের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এর জবাবে বলা হয় যে, সর্বসম্মতভাবে হযরত ওয়ালীদ ইবন উকবাহ্ একজন সাহাবী ছিলেন। আয়াতের শানে নুযূল বিশ্লেষণ করে সাধারণ হুক্মের ভিত্তিতে কোন সাহাবীকে অভিযুক্ত করা মোটেই সমীচীন নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতীর একটি উসূল (নীতি) উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন,

العبرة من عموم اللفظ لا بخصوص السبب[২৭]

'আয়াতের শব্দ থেকে সাধারণ হুকুম তথা সর্বজনীন বিধান প্রবর্তিত হবে। শানে-নুযূলের ভিত্তিতে নয়।' এ নীতির আলোকে এ কথা বলা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا আয়াতে সাধারণভাবে ফাসিক ব্যক্তির পরিবেশিত সংবাদ পরীক্ষা ও যাচাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কোন সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে নয়। উল্লেখ্য যে, ওয়ালীদ ইবন 'উকবাহ্ কোন ফাসিক ব্যক্তি ছিলেন না এবং কোন সময়ই তাঁর থেকে ফিস্ক প্রকাশিত হয়নি। বানূ মুস্তালিক-এর সাথে জাহিলী যুগে তার পূর্ব বিরোধ থাকায় তিনি অনুমানের ভিত্তিতে সজ্ঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা করে রাসূল (সা.)কে তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক সংবাদ দিয়েছিলেন। এতে তিনি কিছুটা ভ্রমের বশবর্তী হয়েছিলেন, যা তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে পরিস্কার করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কোন মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি ছিলেন সদা সত্যবাদী। তাঁর চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ ও নিরবদ্য।[২৮]

---

[২৬] মুহাম্মদ 'আলী সায়েস, *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইবন কাছীর, ১৪২৮ হি/২০০৭ খ্রী.) পৃ. ৪৬০।

[২৭] আস-সুয়ূতী, *আল-'ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (লাহোর: সুহাইল একাডেমী, তাবি), পৃ. ২৯।

[২৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৬; মুফতী মুহাম্মদ শফী', *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (করাচী: ইদারাতুল কুরাআন, তাবি) পৃ. ২৫৫-২৫৭; *আল-জামি' লি- আহকামিল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮১-৫৮২।

সাহাবীগণের মর্যাদা

সকল সাহাবীই ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা স্বচক্ষে রাসূল (সা.)কে দর্শন করে তাঁর সাহচর্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁদের মান-মর্যাদা অনেক উঁচু। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথা পরিব্যক্ত করেছেন। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। ফলে নবীর (সা.) পরেই তাঁদের স্থান। এ বিষয়ে আল-কুরআন থেকে কিছু আয়াত নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

১. আল্লাহ্ বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[২৯]

'-ঐ সমস্ত মুহাজির ও আনসার যারা সবার আগে (ঈমানের দা'ওয়াত কবূল করতে এগিয়ে) এসেছিল, আর যারা নেকভাবে তাদের পেছনে এসেছে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। এটিই বিরাট সফলতা।'

২. আল্লাহ্ বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا[৩০]

'-নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বাই'য়াত গ্রহণ করছিল। তিনি তাদের অন্তরের অবস্থা জেনে নিলেন। তাই তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।'

৩. আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ[৩১]

---

[২৯] সূরাহ্ আত-তাওবাহ্: ১০০।

[৩০] সূরাহ্ আল-ফাত্‌হ: ১।

'-নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, আর যারা হিজরত কারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও তাদেরকে সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃতপক্ষে একে অপরের বন্ধু।'[৩১]

৪. আল্লাহ বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[৩২]

'-এই নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তারা আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি চায় এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে থাকে। এরাই সত্যবাদী। যারা এই মুহাজিরদের আসার পূর্বে ঈমান এনে (মদীনায়) বসবাস করেছিল, তারাই ঐ লোকদেরকে ভালবাসে যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। এমনকি তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয় সে বিষয়ে তারা নিজেদের অন্তরে কোন চাহিদা পর্যন্ত অনুভব করে না। তাদের নিজেদের যতই অভাব থাকুক না কেন তারা নিজেদের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়। যাদেরকে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে বাঁচানো হয়েছে, আসলে তারাই সফলকাম।'

৫. আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[৩৩]

'-তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর খরচ করেছে ও জিহাদ করেছে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা তাদের তুলনায় অনেক বেশী যারা বিজয়ের পূর্বে খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে। অবশ্য আল্লাহ সবার জন্য ভাল ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ খবর রাখেন।'

---

[৩১] সূরাহ্ আল-আনফাল: ৭২।

[৩২] সূরাহ্ আল-হাশর: ৮-৯।

[৩৩] সূরাহ্ আল-হাদীদ: ১০।

৬. আল্লাহর বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ[৩৪]

'-মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা কাফিরদের উপর কঠিন এবং নিজেদের মধ্যে কোমল। আপনি যখন তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদেরকে রুকূ'ও সাজদাহ্ অবস্থায় দেখতে পাবেন। তাঁরা আল্লাহর অনুকম্পা এবং সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে। তাদের চেহারায় রয়েছে সাজদার চিহ্ন, তাওরাতে তাদের এ পরিচয় রয়েছে এবং ইঞ্জীলেও তাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে।'

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁদের মনোবৃত্তি, আচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিকমান সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা দেয়া হয়েছে। তা থেকে বুঝা যায় যে, নবীর (সা.) পরেই সাহাবীগণের স্থান। সাধারণ মুসলিম অপেক্ষা তাঁদের মান-মর্যাদা অনেক উঁচু। তাঁরা মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হওয়ায় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদেরকে সকলকাম হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে এবার আমরা হাদীসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব এবং দেখব রাসূল (সা.) তাঁদের সম্পর্কে কি বলেছেন এবং তাঁদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন। নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলোঃ

এক:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ[৩৫]

---

[৩৪] সূরাহ্ আল-ফাতহ: ২৯।

[৩৫] ইমাম বুখারী, *আল-জামি'উস সহীহ*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খ্রীঃ), পৃ. ৬১৭, হাদীস নং ৩৬৭৩; *সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং-৩৮৬১, পৃ. ৮৭২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, বাবঃ আন-নাহী 'আন সাব্বিস সাহাবা; ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুস সুন্নাহ্, বাবঃ আন-নাহী 'আন সাব্বি আসহাবি রাসূলিল্লাহ্, হাদীস নংঃ ৪৬৫৮; ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, হাদীস নংঃ ১৬১; *মুসনাদ আল-বায্যার*, হাদীস নংঃ ২৭৬৮; আল-বাগাবী, *শারহুস সুন্নাহ্*, ৭ম খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রী.), পৃ. ১৭২; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১; আবূ না'ঈম, *আখবারু ইস্পাহান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২; খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ৭ম খণ্ড, পৃ.

'আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করে তবুও সে তাঁদের এক মুদ বা তার অর্ধ পরিমাণও পৌছতে পারবে না।'

দুই:

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ [৩৬]

'-ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো, আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগ। এরপর তৎপরবর্তী যুগ।

তিন:

عَنْ جَابِرٍعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ [৩৭]

১৪৪; ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, কিতাবুস সুন্নাহ্, বাবুন ফী ফাদায়িলি আসহাবি রাসূলিল্লাহ্, হাদীস নং: ১৬১, পৃ. ২৮।

[৩৬] *সহীহুল বুখারী*, পৃ. ৬১৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, হাদীস নং: ২৫৩৫; আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, বাবঃ মা জাআ ফীল কারনিছ ছালিছ, হাদীস নং, ২২২২; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ৪৬৫৭; *মুসনাদু ইমাম আহমাদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৬, ৪২৭, ৪৩৬, ৪৪০; *সুনানুন নাসাঈ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬; *আল-মুসতাদরাক*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭১; আত-তাহাবী, *মুশকিলুল আছার*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬; আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৫২৬; আবূ না'ঈম, *আল-হিলইয়া*, ২য় খণ্ড পৃ. ৭৮; আল-বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২৭৬৪; আত-তাহাবী, *শরহু মা'আনিল আছার*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।

[৩৭] আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং: ৪৬৫৩; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং: ২৪৯৬; নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪০; আল-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, ২৫শ খণ্ড, পৃ. ২৬৬; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৮৫; *শরহুস সুন্নাহ্*, হাদীস নং: ৩৯৯৪; *সুনানু ইবন মাজাহ্*, হাদীস নং ৪২৮১; তিরমিযী হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেন; عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم قال لايدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر দ্রষ্টব্য: *সুনানুত তিরমিযী*, বাবঃ ফীমান সাব্বা আসহাবান নাবীয়ে, হাদীস নং ৩৮৬৩।

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, সে সমস্ত সাহাবী বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণ করেছেন তাঁদের কেউই জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে না।'

চার:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله اختارنى و اختار أصحابى فجعلهم أصهارى وجعلهم أنصارى وأنه سيجئ فى آخر الزمان قوم ينتقصونهم ألا فلا تناكحوهم ولاتنكحوا إليهم الا فلا تصلوا معهم ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة[৩৮]

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন এবং আমার সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে আমার আত্মীয় বানিয়েছেন এবং সাহায্যকারী বানিয়েছেন। শেষ যামানায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাদের সমালোচনা করবে। সাবধান! তাদেরকে তোমরা বিবাহ করবে না এবং তাদের কারো সাথে বিবাহও দিবে না। সাবধান! তাদের পেছনে নামায পড়বে না এবং তাদের জানাযাও পড়বে না। তাদের উপর লা'নত।'

পাঁচ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ[৩৯]

'তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবেনা। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসল। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব

---

[৩৮] খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফাইয়া ফীল ইলমির রিওয়ায়াহ* (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৯ হি./১৯৮৮খ্রী.), পৃ. ৪৮।

[৩৯] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান* (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.), পৃ. ৮৭২, হাদীস নং ৩৮৬২; আল-হায়ছামী, *মাওয়ারিদ আল-জুমান*, বাব: ফাদলু-আসহাবি রাসূলিল্লাহ, হাদীস নং ২২৮৪, পৃ. ৫৬৯; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭।

পোষণ করল সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের সাথে বিদ্বেষ করল। যে তাদেরকে কষ্ট দিল। সে যেন আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিল। বস্তুত: যে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিল তাকে পাকড়াও করা হবে। ইমাম আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান।'

ছয়:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ[৪০]

'-ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিতে দেখলে বলবে, তোমাদের এই মন্দ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।'

সাত: বিখ্যাত সাহাবী 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ বলেন,

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه و سلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعل وزراء نبيه يقتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهم عند الله سيئ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত বান্দার অন্তরসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর অন্তরকে উত্তম অন্তর হিসেবে পেলেন এবং তা নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাঁকে রিসালাত দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। এরপর তিনি বান্দাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। অতঃপর তিনি সমস্ত বান্দার অন্তরসমূহের মধ্যে রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণের অন্তরকে উত্তম হিসেবে পেলেন এবং তাঁদেরকে স্বীয় নবীর সহযোগী বানিয়ে দিলেন। আর তাঁরা তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করেন। বস্তুত: মুসলমানরা যেটিকে উত্তম হিসেবে মনে করে আল্লাহর নিকট তা-ই- উত্তম হিসেবে বিবেচিত। আর যেটিকে তারা অকল্যাণ মনে করে তা আল্লাহর নিকট খারাপ হিসেবে গণ্য।'[৪১]

---

[৪০] *সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৮৬৬, পৃ. ৮৭৩।

[৪১] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি)। পৃ. ৩৭৯; *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ৩৬০২; আল-বাগাবী, *শরহুস*

সাতঃ রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

أصحابی کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدتم[৪২]

'আমার সাহাবীগণ হলেন, তারকাসদৃশ। তোমরা তাদের যে-কোন এক জনকে অনুসরণ করবে হিদায়াত লাভ পারবে।'

আল-কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে সন্দেহাতীতভাবে সাহাবীগণের মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের সমালোচনা করা ও ত্রুটি অনুসন্ধান করা মুসলমানদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেননা আমরা তাদের মাধ্যমেই দ্বীন পেয়েছি। রাসূল (সা.) থেকে তারা এ দ্বীনের বাণী পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছিয়েছেন। তাই তাদেরকে সমালোচনার আসনে বসিয়ে তাদের ত্রুটি বিচ্যুতির অনুসন্ধান করা এবং তাদের চরিত্র নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ্‌র 'আলিম, মুজতাহিদ ও ফকীহগণ তাঁদের নিষ্কলুষতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। আমরা এ বিষয়ে নিম্নে জগত বিখ্যাত 'আলিমগণের কিছু উক্তি উপস্থাপন করছি:

১. ইমাম আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (মৃত্যু: ৩২১ হি.) বলেন,

نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا نفرط فى حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم و نبغض من يبغضهم و بغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين و إيمان و إحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان[৪৩]

সুন্নাহ্‌, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৫; *আল-মুসতাদরাক*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮; আল-হায়ছামী, *আল-মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮; *মুসনাদ আল-বায্যার*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১২, হাদীস নং ১৮১৬।

[৪২] ইবনু 'আব্দিল বারর, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদলুহু*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১; ইবন হাযম আল-আন্দালুসী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৮২। হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। মুহাদ্দিস আল-বাযযার বলেন, রাসূল (সা.) থেকে এরূপ কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি এবং বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহেও এরূপ কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ হাদীসের সনদে সুলায়মান ইবন আবী কারীমাহ্‌ এবং *জুয়াইবার* নামক যে দু'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন তাদের দুজনকেই মুহাদ্দিসগণ অবিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। দ্রষ্টব্য: *আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৭ পাদটীকা অংশ।

'-আমরা রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণকে ভালবাসি। তাঁদের কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করি না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের ভাল ছাড়া সমালোচনা করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তাদের ভাল দিক ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করি না। আর তাদেরকে ভালবাসা দ্বীনের অংশ ও ইহসান তুল্য তাঁদের প্রতি ঘৃণা করা নিফাক ও বিদ্রোহিতার শামিল।'

২. আবূ বকর জাবির আল-জাযায়িরী বলেন,

يؤمن المسلم بوجوب محبة أصحاب رسول الله وآل بيته وأفضليتهم على من سواهم من المؤمنين والمسلمين وأنهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل وعلو الدرجة بحسب أسبقيتهم في الاسلام[৪৪]

'সাধারণ মু'মিন মুসলিম অপেক্ষা রাসূলের সাহাবী ও তাঁর বংশধরদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদেরকে ভালবাসা যে আবশ্যক তা একজন মু'মিনকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। যদিও মর্যাদা, উচ্চ স্থান এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতার দিক দিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু তারতম্য রয়েছে।'

৩. তিনি আরো লিখেছেন যে,

أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و آل بيته فإنه يحبهم لحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لهم إذ أخبر تعالى أنهم يحبهم ويحبونه في قوله (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم) كما قال في وصفهم (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الله الله" في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فبحبي أحبهم و من أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد اذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه[৪৫]

---

৪৩ ইমাম তাহাবী, *আল-'আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ্*, তাহকীক: ড. 'আব্দুল্লাহ ইবন-'আব্দিল মুহসীন আত-তুরকী, ২য় খণ্ড (মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৭০৪; *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮, হাদীস নং: ৩৬০২; আল-বাগাবী, *শরহুস সুন্নাহ্*, পৃ. ১০৫; *আল-মুসতাদরাক*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮; আল-হায়ছামী, *আল-মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

৪৪ আল জাযায়িরী, *মিনহাজুল মুসলিম* (কায়রো: দারু ইবনিল হায়ছাম, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ৫৪।

৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

'রাসূল (সা.)-এর সাহাবী এবং তাঁর পরিবার পরিজনদেরকে আল্লাহ তার রাসূলের উদ্দেশ্যে ভালোবাসা অনস্বীকার্য। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা খবর দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহও তাদেরকে ভালোবাসেন যেমন, আল্লাহ তা'য়ালার বাণীতে উদ্বৃত হয়েছে যে, অচিরেই আল্লাহ তা'য়ালা এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন, তিনি তাদেরকে ভালবাসবেন, তারাও তাকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে এবং নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। আল্লাহ তাদের আরও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তার সঙ্গে যারা রয়েছেন তারা কাফিরদের উপর কঠোর এবং তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল। রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবেনা। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসল। সে আমাকে ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসল আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করল সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের সাথে বিদ্বেষ করল। যে তাদেরকে কষ্ট দিল। সে যেন আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে প্রকারান্তরে আল্লাহকে কষ্ট দিল। বস্তুত: যে আল্লাহকে কষ্ট দিল তাকে পাকড়াও করা হবে।'

৪. 'আল্লামা 'আযাদুদ্দীন আল-আইজী (মৃত্যু: ৭৫৬ হি.) লিখেছেন যে,

انه يجب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم لأن الله تعالى عظمهم واثنى عليهم والرسول قد أحبهم وأثنى عليهم ثم إن من تأمل سيرتهم ووقف على مأثرهم وجدهم فى الدين وبذلهم وأموالهم وانفسهم فى نصرة الله رسوله ولم يتخالجه شك من عظم شانهم وبرآءتهم عما ينسب إليهم المبطلون من المطاعن[৪৬]

'সকল সাহাবীকে সম্মান করা ওয়াজিব এবং তাদের সমালোচনা করা নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন। রাসূল (সা.) তাদেরকে ভালবেসেছেন এবং প্রশংসা করেছেন। তাদের জীবন-চরিত্রও আত্মা ত্যাগ সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, দ্বীন ও রাসূলের ব্যাপারে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় ও আত্মত্যাগ, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে সাহায্যকরণে

---

[৪৬] আল-আইজী, *কিতাবুল মাওয়াকিফ* (ঢাকা: সৌদিয়া কুতুব খানা, তাবি), পৃ. ৮৫।

তাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সন্দেহাতীতভাবে তাদের মানও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। বাতিল পন্থীরা তাদের প্রতি যা সম্পর্কযুক্ত করে তা থেকে তারা মুক্ত।'

৫. খতীব আল-বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৪ হি.) বলেন,

انه لا يحتاج الى سؤال عنهم و انما يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل اسناده بين من رواه و بين النبى صلى الله عليه و سلم لم يلزم العمل به الا بعد ثبوت عدالة رجاله و يجب النظر فى احوالهم سوى الصحابى الذى رفعه الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم و اخباره عن طهارتهم و اختياره لهم فى نص القران[৪৭]

'তাদের (সাহাবীগণের) ব্যাপারে প্রশ্ন বা কোন সমালোচনা করার প্রয়োজন নেই। তাদের ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে এরূপ করা যৌক্তিক হতে পারে। রাসূল (সা.) থেকে যে বা যারা মুত্তাসিল সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন সে হাদীসগুলোর উপর 'আমল করা তখনই অপরিহার্য হবে যখন সে হাদীগুলোর বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত হবে। সাহাবী ছাড়া অন্যদের সততা বা ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে কথা বলা ক্ষেত্র বিশেষে অপরিহার্য হতে পারে। আর সাহাবীগণ স্বয়ং রাসূল (সা.) থেকে মারফূ' সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ কর্তৃক তাদের সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হয়েছে। আল-কুরআনের ভাষ্যে আল্লাহ কর্তৃক তাদেরকে মনোনীত করার কথা পরিব্যক্ত হয়েছে।'

৬. 'আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু. ৯১১ হি.) লিখেছেন যে,

الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن و غيرهم باجماع[৪৮]

'আলিমগণের ঐক্যমত্যে সকল সাহাবী ফিতনা থেকে মুক্ত ও ন্যায় পরায়ণ।'

৭. ইমাম আল-গাযালী (মৃত্যু. ৫০৫ হি.) লিখেছেন,

والذى عليه سلف الأمة و جماهير الخلف ان عدلتهم معلومة بتعديل الله عز و جل و اياهم وثنائه عليهم فى كتابه[৪৯]

'এ উম্মতের পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমগণ একথার উপর একমত হয়েছেন যে, সাহাবীগণের ন্যায় পরায়ণতা এবং আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক তাদের 'আদালত সর্বজনবিদিত। তিনি স্বীয় মহাগ্রন্থে তাদের প্রশংসা করেছেন।'

---

[৪৭] খতীব আল-বাগাদাদী, *আল-কিফায়াহ্ ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৪৬।

[৪৮] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।

[৪৯] ড. আহমাদ আমীন, *ফজরুল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

ইমাম গাযালীর উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূলুদ্দীন ফ্যাকাল্টির প্রফেসর আব্দুর ওয়াহ্হাব আব্দুল লতীফ লিখেছেন যে, সাহাবীগণের ন্যায় পরায়ণতা আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاس[৫০]

'এ রূপভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি। যাতে তোমরা সমগ্র মানুষের উপরে সাক্ষ্যদাতা হও।'

এখানে وَسَطًا শব্দ দ্বারা ন্যায়পরায়ণতাকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া রাসূল (সা.) তাঁদেরকে উত্তম মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫১] ইমামুল হারামাইন এ প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাঁর মতে, সাহাবীগণের সমালোচনা করা অথবা তাদের 'আদালত প্রশ্নে সংশয় পোষণ করা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ তারা শরী'য়তের ধারক। তাদেরকে অভিযুক্ত করলে শরী'য়তের বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।[৫২]

---

[৫০] সূরাহ্ আলে-'ইমরানঃ ১৪৩।

[৫১] *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।

[৫২] *প্রাগুক্ত*; এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ ইমাম মুহাম্মদ আস-সাফারীনী আল-হাম্বলী প্রণীত *আদ্-দুররাতুল মুদিয়্যাহ্* গ্রন্থ। এ গ্রন্থে প্রায় ৮০ পৃষ্ঠা ব্যাপী সাহাবীগণের 'আদালত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্তঃকলহ বিবাদ নিরসন ও বিদ্রোহীর হুকুম

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

অনুবাদ

৯. 'মু'মিনদের দু'টি দল যদি পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দাও। এরপর যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে না আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মিমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ কর। আল্লাহ ইনসাফ কারীদের পছন্দ করেন।

১০. মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।'

শব্দ বিশ্লেষণ

طَائِفَتَان আরবী ভাষায় দল ও গোষ্ঠী বুঝাতে طَائِفَة শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। اقْتَتَلُوا সঙ্ঘর্ষ করে, লড়াই করে فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا মিমাংসা করিয়ে দাও উভয়ের মধ্যে فَإِن بَغَت যদি কোন একটি দল বাড়াবাড়ি করে। بَغَت শব্দটি بغى থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, বিদ্রোহ করা, যুলুম করা, সীমালঙ্ঘন করা এবং আইন লঙ্ঘন করা। إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى তাদের কোন একটি দল অপর দলের উপর। অর্থাৎ একটি দল অপর দলের বিরুদ্ধে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়, সন্ধি বা মিমাংসা না মানে فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي তাহলে বিদ্রোহী দলের সাথে লড়াই কর। حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله যতক্ষণ না সে দল আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। (فَإِن فَاءَتْ) যদি সেই দল ফিরে আসে فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا তাহলে উভয়ের মধ্য মিমাংসা করিয়ে দাও, بِالْعَدْل ন্যায়ের ভিত্তিতে أَقْسِطُوا তোমরা ইনসাফ কর। বাক্যটি قسط শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো, ন্যায় বিচার। এ জন্য المقسط কে العادل বলা হয়। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة বস্তুত: মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। এর অর্থ হলো ঈমান 'আকীদা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ فَأَصْلِحُوا সংশোধন করিয়ে দাও, মিমাংসা কর بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ তোমাদের দু ভাইয়ের মধ্যে। কেউ কেউ أَخَوَاتِكُمْ এবং أَخْوَانِكُمْ পাঠ করেছেন। وَاتَّقُوا الله তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে আল্লাহকে ভয় করার কারণে। আল-কুরআনে ব্যবহৃত সকল لعل শব্দটি আশা করা যায় অর্থে বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযূল

১. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (সা.)কে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই-এর নিকট যেতে অনুরোধ করা হলো। এরপর রাসূল (সা.) গাধায় চড়ে রওয়ানা করলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লেন। তারা ইবন উবাই-এর নিকট পৌঁছালে নবী করীম (সা.) এর গাধা প্রসাব করল। এতে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই বলল, আপনার গাধার প্রসাব আমাকে কষ্ট দিল। এসময় 'আব্দুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা বললেন, তাঁর (রাসূলের সা.) গাধার প্রসাবের গন্ধ তোমার চেয়ে উত্তম। এতে উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যে সজ্ঘর্ষ বাধে এবং খেজুর শাখা, জুতা ও হাত দিয়ে পিটাপিটি আরম্ভ হয়। এসময় وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ। আয়াতটি নাযিল হয়।[১]

২. অন্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, নবী করীম (সা.) অসুস্থ সাহাবী সা'দ ইবন 'উবাদাকে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালূলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বাদানুবাদ সজ্ঘটিত হয় এবং পরিশেষে তা সজ্ঘর্ষের রূপ নিলে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২]

ইমাম 'আব্দুর রাযযাক মা'মার সূত্রে বর্ণনা করেন, মুসলমানদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয়ে ঝগড়া বাধে। অবশেষে জুতাজুতি ও হাতাহাতি হয়। তখন বিষয়টি নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপস্থাপন করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৩] কাযী আল-বায়দাবী এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনায় লিখেছেন যে, একবার মদীনায় আওস ও খাযরাজ গোত্র দু'টির মধ্যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সজ্ঘর্ষ বাধলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৪]

---

১ *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬; *আত-তাফসীরুল হাদীস*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫; *তাফসীরু বাহরিল মুহীত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩; *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৮; আল-কুরতুবী, *আহকামুল কুরআন*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৮১।

২ *আত-তাফসীরুল হাদীস*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫; *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ্*, পৃ. ৬৫৩।

৩ আবূ বকর আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ৫৩১; *যাদুল মাসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৩।

৪ *তাফসীরুল বায়দাবী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১; মুফতী মুহাম্মদ শফী', *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

৩. ইবন জারীর আল-তাবারী ও ইবনু আবী হাতিম সুদ্দী (রহ) থেকে রিওয়ায়াত করেন, 'ইমরান নামে জনৈক আনসারীর স্ত্রী তার মায়ের বাড়ী যেতে চাইলে 'ইমরান তাতে বাধা দেয় এবং তাকে (স্ত্রীকে) ঘরের চিলাকোঠায় আটকে রাখে। স্ত্রীর এ অবস্থা জেনে তার মায়ের বাড়ীর লোকেরা চলে আসে এবং তাকে কোঠা থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। এসময় স্বামী 'ইমরান বাইরে ছিলেন। তিনি এসে এরূপ অবস্থা দেখে তার গোত্রকে সাহায্যের জন্য ডাকে। তার চাচাতো ভাইরা এসে তার স্ত্রীকে নিতে বাধা দেয়। ফলে উভয় পক্ষে ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হয় এবং জুতা ও খেজুর শাখা দিয়ে মারামারি শুরু হয়। তখন তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। এরপর নবী করীম (সা.) প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করিয়ে দেন। ফলে তারা সবাই আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।[৫]

কাতাদা (রহ.) বলেন, আয়াতটি আনসারী দু'জন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। এ ঘটনায় উক্ত দু'জন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর হাতাহাতি হয়। কিন্তু কোন অস্ত্র লড়াই হয়নি। আয়াতটি অবতীর্ণের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসতে আহ্বান জানানো হয়।[৬]

তাফসীর

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

(যদি মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করিয়ে দাও।) এখানে সংশোধন ও মিমাংসার অর্থ হচ্ছে, যালিমকে তার যুলম থেকে বাঁধা দেয়া, ভুল-বুঝাবুঝি নিরসন করা, উভয় পক্ষকে পারস্পরিক বৈরিতা ও হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করার উপদেশ দেয়া এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের মিমাংসাকে মেনে নেয়ার প্রতি আহবান জানানো। এটিই মনোমালিন্য ও পারস্পরিক লড়াই থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।[৭] এ প্রসঙ্গে ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন,

---

[৫] *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৬৪; *আদ দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯০; *আত-আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

[৬] *তাফসীর আল-তাবারী*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৪৮; ইমাম সুয়ূতী, *ফী আসবাবিন নুযূল* (কায়রোঃ দারুত তাকওয়া, তা.বি), পৃ. ৩৩১; *আত-আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪; *যাদুল মাসীর*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; *আন-নুকাতা আল-উ'য়ূন*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

[৭] *আত-আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪; *আল-ওয়াজীয ফী তাফসীরিল কিতাবিল 'আযীয*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১৭; *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৮; *রূহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৮।

إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله وينصف بعضهم من بعض فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله حتى ينصف المظلوم من الظالم فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ وحق على إمام المؤمنين والمؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله[৮]

'আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে নবী করীম (সা.) ও মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, মু'মিনদের কোন একটি দল যখন পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসার জন্য এবং পরস্পরের মধ্য ইনসাফ কায়েমের জন্য আহ্বান বানানো হবে। এতে তারা যদি সম্মত হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিবেন। যাতে যালিমের যুলুম থেকে মাযলূম ব্যক্তি ন্যায় বিচার পায়। যদি বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কেউ এ ফায়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও মু'মিনগণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে এবং আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেয়।'

আয়াতটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে এর বিধান কার্যকর হয়। ইমাম বাগাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (সা.) তা পাঠ করে শুনালেন। সাথে সাথে মুসলমানরা তাদের পারস্পরিক বিরোধ মিমাংসা করে ফেলল এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত হলো।[৯]

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে কোন সজ্ঘর্ষ দেখা দিলে এ দু:খজনক অবস্থায় মুসলিম জনসাধারণ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। তখন নেতৃস্থানীয় লোক অথবা সরকার প্রধানের দায়িত্ব হবে লড়াইয়ে লিপ্ত লোকদের মাঝে সন্ধি ও সমঝোতা সৃষ্টি করে দেয়া। কেননা মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। তারা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ মহান বন্ধন সংরক্ষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।[১০]

আয়াতটিতে জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ বা সংগঠনকে দলাদলি সজ্ঘাত ও সজ্ঘর্ষ থেকে রক্ষা করার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার

---

[৮] *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৬।

[৯] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৫; *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

[১০] *আদওয়াউল বায়ান*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৮২; *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯।

মাধ্যমে আল্লাহর ভয় ও অনুগ্রহের আশা পোষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মু'মিনদের দু'দলের এরূপ সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অথবা উভয়দলেরই কোন না কোন দিক দিয়ে বিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও তাদের উভয়ের মধ্যে ঈমান বহাল থাকা সম্ভব বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[১১]

ইমাম বুখারী এ আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে বলেন, ছোট অথবা বড় গুনাহের কারণে কোন মুসলমান অথবা মু'মিন ব্যক্তি ঈমানের সীমারেখা থেকে বহির্ভূত হয় না। কিন্তু মু'তাযিলা ও খারিজী সম্প্রদায়ের অভিমত এর বিপরীত। তারা বলে থাকে যে, কবীরাহ্ গুনাহ্কারী ব্যক্তি কাফির। সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, আবূ বাকরাহ (রা.) বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ[১২]

'রাসূল (সা.) একদা বক্তৃতা দিলেন। মিম্বরে তাঁর সাথে হাসান ইবন 'আলী ছিলেন। রাসূল (সা.) তার দিকে একবার এবং সমবেত লোকদের দিকে একবার তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, এটি আমার ছেলে। সে নেতা হবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বিবাদমান দলের মধ্যে মিমাংসা করিয়ে দিবেন।'

فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

(এরপর যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।) যদি একপক্ষ অপর পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের ডাকে সাঁড়া না দেয় এবং তার কাছে এমন শক্তি বিদ্যমান থাকে যে, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখা যাচ্ছে না। এমনিভাবে তাদেরকে বন্দি করাও সম্ভব নয় তাহলে তাদের সাথে লড়াই করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে। তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আনার জন্য অস্ত্রসস্ত্র

---

[১১] *আত-তাফসীরুল হাদীস*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫১১; *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ্*, পৃ. ৬৭৪।
[১২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং ২৭০৪, ৩৬২৯, ৩৭৪৬, ৭১০৯।

অথবা যে কোন যুদ্ধ উপকরণ দ্বারা তাদের সাথে লড়াই করতে হবে। এক কথায় অবস্থাভেদে তাদেরকে দমন করার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা বৈধ। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক অথবা মাযলূম হোক। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মাযলূমকে তো সাহায্য করতে হবে। কিন্তু যালিমকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল (সা.) বললেন, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা কর। এটিই হবে তাকে সাহায্য করা।[১৩]

فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মিমাংসা করিয়ে দাও এবং ইনসাফ কর। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।) লড়াই করার পর যদি বিদ্রোহী দল তাদের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট হয় তাহলে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর উচিৎ লড়াইরত দু'টি দলের মধ্যে ন্যায় ইনসাফের সাথে সমঝোতা করে দেয়া এবং আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল হয়ে উভয় দলের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্ণয় করা। আর বিদ্রোহী দলকে তাদের বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে পরবর্তীকালে তারা পুনরায় নতুন করে বিদ্রোহ করার সুযোগ না পায়। আয়াতের সাধারণ ভাষ্য যেন এভাবে নির্দেশ করছে, লড়াইরত উভয় দলের মধ্যে হে মধ্যস্থতা কারীগণ!। তোমরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সততার সাথে ভুল বুঝাবুঝির নিরসন কর। তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন এবং তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। আর তোমরা তোমাদের প্রত্যেক কাজে ন্যায়-নিষ্ঠার অনুসরণ করবে।[১৪]

হাদীসে ন্যায়-পরায়ণ বিচারকদের মর্যাদা ও মহা পুরস্কারের কথা ঘোষিত হয়েছে। যেমন, হযরত ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا[১৫]

---

[১৩] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২২৪৪।

[১৪] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

[১৫] *সুনানুন নাসাঈ*, কিতাবু আদাবিল কুদাত, হাদীস নং- ৫৩৭১।

'দুনিয়াতে ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁদের ন্যায়বাদিতার কারণে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সামনে মনিমুক্তাখচিত মিম্বরে উপবেশন করবে।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ

'সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ সেই কঠিন দিনে তাঁর ছায়ায় আশ্রয়দান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাঁদের মধ্যে হলেন, ন্যায় বিচারক শাসক।'[১৬]

হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

'নিশ্চয় যারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করে আল্লাহর নিকট তারা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হলো এমন ধরণের লোক, যারা তাদের বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যে সব দায়-দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয় সেসব বিষয়ে ন্যায় পরায়ণতার সাথে সুবিচার করেছে।'[১৭]

ইয়াদ ইবন হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)কে এই বলতে শুনেছি,

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

'জান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণীর লোক। ১. ন্যায় বিচারক শাসক, যাকে শক্তিদান করা হয়েছে (দান-খয়রাত করার); ২. দয়াদ্র ও রহম দিল ব্যক্তি, যার অন্তর আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম এবং ৩. যে ব্যক্তি পূত পবিত্র এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং পরিবার পরিজনের অধিকারী।[১৮]

---

[১৬] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাবুস সাদাকাহ্ বিল ইয়ামীন, হাদীস নং ১৪২৩।

[১৭] *সুনানুন নাসাঈ*, কিতাবু আদাবিল কুযাত, হাদীস নং ৫৩৭২।

[১৮] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২৩৮০।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াতের মাধ্যমে লড়াই ব্যতীত সামান্য মত পার্থক্যের বিষয়টিও মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মু'মিনগণ সকলেই পরস্পর ভাই ভাই এবং তাদের মূল এক ও অভিন্ন। আর সেটি হলো ঈমান। সূতরাং ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত মু'মিনদের মধ্যে মিমাংসা করা শাসক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপর ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[১৯]

'মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না। গালি দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে ব্যাপৃত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে ব্যাপৃত থাকেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুলসলমানের কষ্ট দূর কর, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।'

সাহ্ল ইবন সা'দ আস-সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ.[২০]

'একজন মু'মিনের সাথে অপর একজন মু'মিনের সম্পর্ক তদ্রুপ যেমন, দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। একজন ঈমানদার অপর ঈমানদার ভাইয়ের জন্য কষ্ট অনুভব করবে যেমন, মাথা দেহে প্রতিটি অংশের ব্যাথা অনুভব করে।'

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.[২১]

'পারস্পরিক সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য একটি দেহের মতই। দেহের কোন অংশ আঘাত লাগলে গোটা শরীর যেমন, জ্বর ও অনিদ্রায় ভোগে, তেমনি একজন মু'মিন অপর মু'মিনে ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে থাকে।'

---

[১৯] 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬২; *শরহুস সুন্নাহ্*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৯৭।

[২০] ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২১৮০৭।

[২১] *সহীহ্ মুসলিম*, হাদীস নং- ৪৬৮৫।

শর'ঈ আহকাম

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে উদ্ভাবিত শর'ঈ বিধান নিম্নরূপ:

১. বিদ্রোহ ও হানাহানিতে লিপ্ত মুসলমানদের দুই দলকে ভালো উপদেশ ও নির্দেশের মাধ্যমে প্রথমে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান জানানো ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের অপরিহার্য দায়িত্ব। এছাড়া রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ অনুযায়ী তাদের এ বিদ্রোহ দ্রুত নিরসন করা ওয়াজিব।[২২] এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহলো হযরত 'আলীর (রা.) খিলাফতকালে একদল মুসলমান (খারিজী) তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কীভাবে তাদের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন উক্ত ঘটনায় তা বিধৃত হয়েছে। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন, যখন প্রায় ছয় হাজার বিদ্রোহী হযরত 'আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য *হারুরিয়া*[২৩] নামক স্থানে একত্রিত হয় তখন আমি হযরত 'আলীকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নামায একটু বিলম্ব করুন। আমি এই বিদ্রোহীদের সাথে কথা বলতে চাই। হযরত 'আলী বললেন, আপনি তাদের কাছে গেলে অপমানিত হতে পারেন। আমি বললাম, কখনোই না। এরপর আমি পোষাক পরে তাদের নিকটে গেলাম। তারা আমাকে দেখে বলল, সাদর সম্ভাষণ হে ইবন 'আব্বাস! আপনার আগমনের কারণ কী? আমি বললাম, আমি নবী করীম (সা.)-এর মুহাজির, আনসার সাহাবীগণ ও তাঁর চাচাত ভাই এবং জামাই 'আলীর (রা.) পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। তারা এ মহাগ্রন্থের অবতারিত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত; কিন্তু তোমাদের মধ্যে তাদের অনুরূপ কেউই তো নেই। আমি তোমাদের কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমরা যা বলবে আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিব। আমার এ কথা শুনে তাদের এক দল একটু সরে এসে আমার সঙ্গে কথা বললো, আমি বললাম, তোমরা রাসূলের সাহাবীগণ এবং তার চাচাত ভাই ও জামাই থেকে কি প্রতিশোধ নিতে চাও? তারা বললো, তার (আলী রা.) সম্পর্কে আমাদের তিনটি প্রশ্ন রয়েছে। **প্রথম প্রশ্ন হলো** এই যে, তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের বিচারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ

---

[২২] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২০; *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৭৮।

[২৩] **হারুরিয়া:** এটি কুফার থেকে দু'মাইল অদূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। এখানে সর্বপ্রথম খারিজীরা একত্রিত হয়ে হযরত 'আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। এ গ্রামের দিকে সমম্বয়ুক্ত করে খারিজীদেরকে হারুরিয়াও বলা হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য: ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামূল বুলদান, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহ্‌ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), পৃ. ১৩৮।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,[২৪] إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ **দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো**, তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে কাউকে বন্দি করেননি এবং যুদ্ধলব্ধ কোন সম্পদকে গণীমতের মাল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। যদি তারা কাফির হতো তাহলে আমাদের জন্য তাদের নারী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল হতো। আর তারা যদি মু'মিন হয় তাহলে আমাদের জন্য তাদের রক্ত হারাম। **তৃতীয় প্রশ্ন হলো**, তিনি নিজ থেকে আমীরুল মু'মিনীন উপাধি বিলুপ্ত করেছেন। যদি তিনি আমীরুল মু'মিনীন না হন, তাহলে কি তিনি আমিরুল কাফিরীন? আমি বললাম, এ তিনটি প্রশ্ন ছাড়া আর কি তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে? তারা বলল, না এ তিনটি প্রশ্নই আমাদের যথেষ্ট। আমি বললাম, আমি যদি কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর আলোকে তোমাদের এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই তাহলে কি তোমরা ফিরে আসবে? তারা বলল, অবশ্যই। আমি বললাম, তোমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, হযরত 'আলী (রা.) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের ফায়সালা গ্রহণ করেছেন। এর জবাব হিসেবে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে উভয়ের মধ্যে সমঝোতার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা উভয় পক্ষের দু'জন শালিস নিযুক্ত করার বিধান দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন[২৫],

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, মানুষের জান মাল রক্ষার্থে এবং পারস্পরিক সংশোধনের জন্য মানুষকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা অধিক যুক্তিযুক্ত নয় কি? তারা বললো, মানুষের জান মালের হিফাযত ও পারস্পরিক সংশোধনের বিষয়ই অধিক যুক্তিসম্মত। এরপর আমি বললাম, তোমরা বলেছো যে, হযরত 'আলী যুদ্ধ করেছেন; কিন্তু কাউকে বন্দি করেননি এবং গণীমত লাভও করেন নি। এর জবাব হলো এই যে, তোমরা কি চাও তোমাদের মা নবী স্ত্রী 'আয়িশাকে (রা.) বন্দী করতে। যদি তোমরা তাই চাও তাহলে তোমরা কুফরী করলে। আর যদি তোমরা বল, নবী স্ত্রী আমাদের মা নন তাহলেও তোমরা কুফরী করলে। আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেন[২৬] النبى أولى بالمؤمنين من انفسهم। সুতরাং তোমরা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ। তোমরা প্রশ্ন করেছ যে, হযরত 'আলী নিজ থেকেই আমীরুল মু'মিনীন উপাধি বিলুপ্ত করেছেন। তোমরা জেনে রাখ? হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন রাসূল (সা.) সন্ধিপত্রে *রাসূলুল্লাহ* শব্দটি লিখতে চেয়েছিলেন, তখন কুরাইশরা বাধা দিয়েছিল। ফলে তিনি তা না লিখে শুধু মুহাম্মদ ইবন আব্দিল্লাহ

---

[২৪] সূরাহ্ আল-আন'আম: ৫৭।

[২৫] সূরাহ্ আন-নিসা: ৩৫।

[২৬] সূরাহ্ আল-আহযাব:

লিখেছিলেন। রাসুল (সা.) বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। হে আলী! তুমি শুধু মুহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল্লাহ লিখ।" আল্লাহর রাসূল (সা.) 'আলী (রা.) থেকে উত্তম। অথচ তিনি নিজের নামের শেষে *রাসুলুল্লাহ* শব্দটি লেখা থেকে বিরত ছিলেন। তাই হযরত 'আলী যদি নিজেকে আমীরুল মু'মিনীন না বলেন তাতে কোন অসুবিধাতো নেই। এ কথা শুনে তারা সন্তুষ্ট হলো ও তাদের মধ্য থেকে দু'হাজার বিদ্রোহী ফিরে আসল। আর অবশিষ্টদের সঙ্গে হযরত 'আলী (রা.), মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণ যুদ্ধ করলেন।[২৭] এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে বিদ্রোহীদেরকে শাসকের ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। তারপর তারা যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২. যদি বিদ্রোহী দল আল্লাহর হুকুম পালনে সাড়া না দেয় এবং তাদের বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে তাহলে প্রথমে তাদেরকে লঘু হুমকির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ওয়াজিব, যাতে করে তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে দ্রুত তাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমাধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২৮]

৩. আয়াত দু'টি (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) থেকে প্রমাণিত যে, বিদ্রোহী দল ঈমানের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায় না। তাদেরকে *মুসলিম* বা *মু'মিন* বলা যাবে।[২৯] কারণ তারা বিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও আয়াতে তাদের ক্ষেত্রে *মু'মিন* শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য এখানে ইমাম বাগাবীর বর্ণনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি হারিস আল-'আওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা হযরত আলীকে (রা.) জিজ্ঞেস করা হলো, সিফফীন ও উষ্ট্রের যুদ্ধে যারা বিদ্রোহী ছিল তারা কি মুশরিক ছিল? তিনি বললেন, তারা মুশরিক ছিল না। তারা শিরক থেকে পলায়ন করেছিল। তাঁকে বলা হলো, তারা কি মুনাফিক ছিল? তিনি বললেন না। মুনাফিকরাতো আল্লাহকে কম স্মরণ করে। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে তারা কী ছিল? এর উত্তরে হযরত আলী (রা.) বললেন, তারা ছিল আমাদের-ই ভাই, যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[৩০]

---

[২৭] *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; *আল-মুস্তাদরাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০।

[২৮] ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ আল-হালাবী, *মুল'তাকাল আবহুর*, তাহকীক: ওয়াহাবী সুলায়মান আল-আলবানী (দামিস্ক: দারুল বীরুনী, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৫৪-৩৫৫।

[২৯] মুফতী মুহাম্মদ, আহকামুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৪।

[৩০] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৪; তাফসীর আল-তাবারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬।

৪. উল্লিখিত আয়াতে تبغى শব্দ দ্বারা বিদ্রোহের কথা বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় بغاوة শব্দের সঠিক অর্থ কী? এবং ইসলামী শরী'য়াতে বিদ্রোহের হুকুম কী? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আরবী অভিধানে بغي শব্দের অর্থ হলো, অনুসন্ধান করা। যেমন, আল-কুরআনে এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ বলেন,[৩১] ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ 'আমরা তো সে স্থানটিই অনুসন্ধান করছিলাম।' সুতরাং فإن بغت আয়াতে بغى দ্বারা সেসব বস্তু অনুসন্ধান করাকে বুঝানো হয়েছে যা ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। যেমন, যুলুম, অত্যাচার ও শর'ঈ বিধান মান্য করতে অস্বীকৃতি ও সীমা লঙ্ঘন করা।[৩২] আর ইসলামী শরী'য়তের পরিভাষায় هم الخارجون عن الامام الحق। অর্থাৎ যারা ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসে তাদেরকে الباغى। বা বিদ্রোহী বলা হয়।[৩৩] ফকীহদের দৃষ্টিতে শব্দগত কিছু বেশ কম ছাড়া الباغى। তথা বিদ্রোহীর সংজ্ঞা প্রায় একই রূপ। মালিকীদের মতে, যারা রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে যায় তাদেরকে الباغى। বলে।[৩৪] শাফি'ঈদের মতে, যে রাষ্ট্র দ্বীন রক্ষার্থে নবুয়্যাতের ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত সে রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের আনুগত্য থেকে যারা বেরিয়ে আসে তারাই বিদ্রোহী।[৩৫] হাম্বলীদের মতে, যারা অনুসরণযোগ্য ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় তারাই যালিম ও বিদ্রোহী।[৩৬] জা'ফরীদের মতে, যে ন্যায় পরায়ণ শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং উক্ত শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে সে বিদ্রোহী।[৩৭]

এরূপ মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে শর'ঈ নীতিমালা কী? তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বলা যায় যে, আয়াতটি

(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)

---

[৩১] সূরাহ্ আল–কাহাফ: ৬৪।

[৩২] ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূ'মিল ইসলামিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১০৩।

[৩৩] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড (পাকিস্তান: আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৩৩৪।

[৩৪] সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূস আল-ফিকহী* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ৪০।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*।

[৩৬] *প্রাগুক্ত*।

[৩৭] *প্রাগুক্ত*।

মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক শর'ঈ বিধান। এছাড়া রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্য় অল্প কিছু হাদীছ ছাড়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। এর কারণ হলো, নবী করীম (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন যুদ্ধ সজ্ঘটিত হয়নি যে, তা থেকে এ বিধানের যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে হযরত 'আলীর (রা.) খিলাফতকালে যখন মুসলমানদের মধ্যে এরূপ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ সজ্ঘটিত হয় তখন এ বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে সময় বহু সংখ্যক সাহাবী জীবিত থাকায় তাদের কর্মকাণ্ড ও নির্দেশাবলী থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে 'আলী (রা.)-এর নীতি ও কর্মপন্থা এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবীগণের গৃহীত পদক্ষেপ সমস্ত ফিকহ্‌বিদের কাছে বিদ্রোহ দমনের মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়েছে।

পারস্পরিক লড়াই বা বিদ্রোহের হুকুম

মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্রোহ ও যুদ্ধের কয়েকটি ধরণ হতে পারে এবং এর প্রত্যেকটি ধরণ সম্পর্কে শরী'য়াতের বিধানও ভিন্ন ভিন্ন।[৩৮] যেমন,

* যুদ্ধরত দুটি দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের মধ্যে বিরোধ নিরসন করা অথবা এ দুটি দলের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী দলকে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের বিদ্রোহ দমন এবং তাদেরকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।[৩৯] অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিধান প্রবর্তিত হবে। এ প্রসংগে ড. যুহায়লীর বক্তব্য হলো,

فصل العلماء الحكم فى البغاة فقالوا إن اقتلت فئتان على البغى منهما جميعا أصلح بينها فان لم يصطلحا وأقامتا على البغى قوتلتا وان كانت احداهما باغية على الاخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغى ألى ان ترضى بالصلح فإن تم الصلح بينهما وبين المبغى عليها وجب عقده بالقسط والعدل[৪০]

'বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে 'আলিমগণের মতামত হলো, যদি দু'টি দল পরস্পর বিদ্রোহে লিপ্ত হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার সমাধান করে দিবেন। যদি

---

[৩৮] সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ৭৬-৮২।

[৩৯] আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৫৯৮; মুফতী মুহাম্মদ শফী', *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

[৪০] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৪১।

উভয় দল উক্ত সমাধান না মানে এবং বিদ্রোহের স্বপক্ষে প্রমাণ দাঁড় করাই, তাহলে উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হবে। আর যদি এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে যে দলটি বিদ্রোহ করছে তাদেরকে সন্ধিতে সম্মত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এরপর যখন তারা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে তখন তাদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক সমাধান করতে হবে।'

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ 'আলী সায়েস লিখেছেন যে,

والخطاب فى الأية الكريمة لولاة الأمور والأمر فيها للوجوب فيجب الاصلاح بالنص فإن أبت إحداهما من البغي وجب قتالها قاتلت فإن رجعت عن بغيها والتزمت حكم الله تركت [৪১]

' وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا এ আয়াতে শাসকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিদ্রোহরত উভয় দলের মধ্যে ফায়সালার নির্দেশটি ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। তাই উভয়ের মধ্যে সংশোধন করা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ওয়াজিব। যদি উভয় দলের একটি দল মীমাংসা অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। অতঃপর যদি তারা বিদ্রোহ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহর হুকুমকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিত্যাগ করতে হবে।'

* ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মতে যুদ্ধরত দু'পক্ষই যদি পার্থিব স্বার্থের জন্য লড়াই করে তখন মু'মিনদের কাজ হলো, তাদের এই ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত রাখা।[৪২] কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَنْ فَرَّ مِنْ الْفِتْنَةِ أَعْتَقَ اللّٰهُ رَقَبَتَهُ مِنْ النَّارِ[৪৩]

'যে ব্যক্তি ফিতনা থেকে পলায়ন করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন'।

রাসূল (সা.) এরূপ ফিতনা থেকে দূরে সরে থাকার জন্য ইবনে মাস'উদ (রা.) কে বলেছেন,

---

[৪১] মুহাম্মদ 'আলী সায়েস, *তাফসীরুল আয়াতিল আহকাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮।

[৪২] *আল-মাবসূত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৪।

[৪৩] *প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৮।

كُنْ حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِ بَيْتِكَ . فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ فَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ

'তুমি বাড়িতে বসে থাক এমতাবস্থায় তোমার কাছে যদি ফিতনা এসে যায় তাহলে তুমি আল্লাহর এমন বান্দাহ্, যিনি শহীদ'।[৪৪]

ইমাম আবূ হানীফাহ্র (রহ.) উপরিউক্ত মতটি ইমাম বা শাসকের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে। অন্যথায় ন্যায় পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে শাসককে সাহায্য করা ওয়াজিব হবে।[৪৫]

* বিদ্রোহী দু'টি দলের মধ্যে একটি দল যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপর দল যদি বাড়াবাড়ি করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং কোনরূপ মীমাংসায় সম্মত না হয়, সে ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থী দলের পক্ষাবলম্বন করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব।[৪৬]

ইমাম বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হুকুম

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং তাদের বিষয়ে ইসলামী শরী'য়াতের বিধানও বিভিন্ন ধরনের হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

কোন প্রকার শরী'য়াত সম্মত কারণ ছাড়াই যারা সরকারের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সংঘবদ্ধ হয়, তাদেরকে দমন করার জন্য সরকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মতভাবে বৈধ। তবে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে তাদেরকে আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।[৪৭] এ প্রসঙ্গে আল-খাযিন লিখেছেন যে,

فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الامام العدول بتأويل محتمل ونصبوا لهم اماما فالحكم فيهم أن يبعث إليهم الامام ويدعوهم إلى طاعته فإن اظهروا مظلمة أزالها عنهم ولم يذكروا مظلمة وأصروا على البغى قاتلهم الامام حتى يفئوا إلى طاعته[৪৮]

'যখন কোন শক্তিশালী ও প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী সম্পন্ন দল একত্রিত হয়ে বানানো যুক্তির ভিত্তিতে ন্যায় পরায়ণ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজেদের

---

[৪৪] আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৪২৫৬; *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদীস নং ৪১৪৭।

[৪৫] আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়াহ্*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৮৮২।

[৪৬] *আহকামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৭; মুফতী মুহাম্মদ শফী', *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

[৪৭] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, ৯ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০২ খ্রী.) পৃ. ৫৮৮; *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ্*, পৃ. ৬৭৫।

[৪৮] *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০।

জন্য আরেকজন ইমাম নিযুক্ত করে তাহলে তাদের বিষয়ে হুকুম হলো, রাষ্ট্রপ্রধান প্রথমে তাদেরকে বুঝানোর জন্য তাদের নিকট একজন দূত পাঠাবেন, তিনি তাদেরকে ইমাম বা রাষ্ট্র প্রাধানের আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান জানাবেন। তারা যদি বিদ্রোহের কারণ হিসেবে কোন যুক্তি উত্থাপন করে সেক্ষেত্রে দূত তা খণ্ডন করবেন। আর যদি তারা কোন অভিযোগ বা যুক্তি উত্থাপন না করে বিদ্রোহে রত থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তার (রাষ্ট্র প্রধানের) আনুগত্যে ফিরে আসে।'

যে সরকার ন্যায় নিষ্ঠ এবং বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত তার ব্যাপারে বিদ্রোহীদের কাছে শরী'য়ত সম্মত ব্যাখ্যা থাক আর না থাক সর্বাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াই করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে মুফাসসির আল-আলূসীর (মৃত্যু: ১২৭০ হি.) বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

والحق أن ذلك ليس على إطلاقه بل إذا خشي من ترك قتالهم مفسدة عظمية دفعها أعظم من مصلحة الجهاد وظاهر الأية أن الباغي مؤمن لجهل الطائفتين الباغية والمبغى عليها من المؤمنين نعم الباغي على الامام ولو جائرا فاسق مرتكب لكبيرة ان كان بغيه بلا تأويل أو بتأويل قطعي البطلان.[৪৯]

'একথা সত্য যে, এ বিধান সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি; বরং এটি এক বিশেষ অর্থ বহন করে। সেটি হচ্ছে, যদি বিদ্রোহ দমন না করলে বড় ধরনের হাঙ্গামার আশংখা থাকে তাহলে বিদ্রোহ দমন করাই অধিক যুক্তি সংগত। আয়াতটির প্রকাশ্য নির্দেশনা এটিই প্রমাণ করে যে, বিদ্রোহী মু'মিন। বিদ্রোহরত দু'টি দল এবং যার সঙ্গে বিদ্রোহ করছে তাদের অবস্থা অজ্ঞাত হওয়ার কারণে তারা মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ ফাসিক অথবা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও যুক্তি থাকুক আর না থাকুক উভয় অবস্থায় বিদ্রোহ করা অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ।'

যে সরকার পেশী শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার নেতৃবৃন্দ ফাসিক, এমন সরকারের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ হয় এবং বিদ্রোহীরা যদি সৎ ও নিষ্ঠাবান হয় এবং আল্লাহর বিধান কায়েমের জন্য সদা সচেষ্টবান হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ফিক্হবিদ ও আহলুল হাদীসের মতে, যে নেতার নেতৃত্ব একবার

---

[৪৯] আল-আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১২।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুসজ্জিত রয়েছে। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারী যাই হয়ে থাকুন না কেন এবং তার নেতৃত্ব বা সরকার যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী বলেন,

فإن كان المسلمون مجتمعين على واحد وكانوا آمنين به والسبل آمنة فخرج عليه طائفة من المسلمين فحينئذ يجب على من يقوى على القتال أن يقاتل مع إمام المسلمين الخارجين لقوله تعالى (فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) والأمر حقيقة للوجوب ولان الخارجين قصدوا أذى المسلمين واماطة الاذى من أبواب الدين وخروجهم معصية ففى القيام بقتالهم نهى عن المنكر وهو فرض ولانهم يهيجون الفتنة قال صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.[৫০]

'মুসলমানরা যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং সে শাসকের সুশাসনের ফলে দেশের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং জন নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কোন জনগোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে মুসলমানদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। এখানে লড়াইয়ের নির্দেশ ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। কেননা বিদ্রোহীরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে চায়। আর কষ্টদায়ক বস্তুর মুলৎপাটন দ্বীনের একটি অংশ এবং ইমামের আনুগত্য থেকে বিদ্রোহীদের বের হওয়া গুনাহের কাজ। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা নাহী '*আনিল মুনকারের* দায়িত্ব পালন করার মত যা ফরয হিসেবে গণ্য হবে। অপরদিকে তাদের বিরুদ্ধে এজন্য লড়াই করতে হবে যে, তারা ফিতনা বা বিপর্যয়কে উসকে দিচ্ছে। অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন, ফিতনা ঘুমন্ত, যে ব্যক্তি একে জাগ্রত করে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়।'

হাম্বলী মাযহাবের কিছু কিছু ফকীহও এরূপ মত পোষণ করেন। তারা বলেন,

ان قتال الباغيين أفضل من الجهاد احتجاجا بأن عليا كرم الله وجهه اشتغل فى زمان خلاقته بقتالهم دون الجهاد والحق ان ذلك ليس على اطلاقه بل إذا خشى من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد.[৫১]

---

[৫০] আস-সুরুখসী, *আল-মাবসূত*, ৯ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ১২৪।
[৫১] আল-আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১১।

'বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা জিহাদ থেকে উত্তম। এর কথার দলীল হলো, 'আলী (রা.) তাঁর খিলাফতকালে জিহাদ ব্যতীত শুধু লড়াইয়ের মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে দমন করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রকৃত বিধান হলো এই যে, যদি বিদ্রোহ দমন না করলে বড় ধরনের হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকে তাহলে বিদ্রোহ দমন করাই জিহাদ থেকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত।'

মুসলিম ফকীহগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ একদল এবং বড় বড় ইসলামী পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, শুধু ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম বা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদেরকে বিদ্রোহী বলা যাবে। পক্ষান্তরে যালিম, ফাসিক ও অসাধু ইমাম বা সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে সৎ ও নেককার লোকদের বিরোধিতাকে বিদ্রোহ বলা যাবে না এবং তাদেরকে বিদ্রোহী হিসেবেও আখ্যায়িত করা যাবে না। কেননা তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। নবী করীম (সা.)- এর বাণী এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রাসূল (সা.) বলেছেন,

أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ[৫২]

"ফাসিক রাষ্ট্র প্রধানের সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ।"

যালিম শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.)-এর মত ও ফাতওয়ার উপর ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁর মতে এরূপ যুদ্ধ শুধু বৈধই নয়; বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওয়াজিব।[৫৩] তিনি উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবন আলীর বিদ্রোহে শুধু অর্থ দিয়েই সাহায্য করেননি; বরং অন্যদেরকে তা করতে উপদেশ দেন।[৫৪] যেমন, আল-কারদারী বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়দ ইবন 'আলী (রা.) উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সম্মতি নেয়ার লক্ষ্যে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। দূত তাঁর নিকট উপনীত হলে তিনি বললেন,

لو علمت ان الناس لايخذلونه ويقومون معه قيام صدق لكنت اتبعه واجاهد معه من خالفه لأنه إمام حق ولكنى أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه لٰكنّى أعينه بمالى فيتقوى به على من خالفه وقال لرسوله ابسط عذرى عنده وبعث اليه بعشرة ألاف درهم.[৫৫]

---

[৫২] *আল-মুসতাদরাক*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০১; *জামি'উল আহাদীস*, পৃ. ১৯৮; *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৪৩৪৪; আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৩; *আল-মু'জামুল কাবীর*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭; *কানযুল 'উম্মাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯।

[৫৩] আল-জাস্সাস, *আহকামুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১; *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৮।

[৫৪] *প্রাগুক্ত*।

[৫৫] আল-কারদারী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফাহ্*, ১ম খণ্ড (পাকিস্তান: কোয়েটা তাবি), পৃ. ২৬০।

'যদি আমি জানতে পারতাম লোকেরা তাঁকে অপমানিত করবে না এবং তাঁর পাশে তারা সঠিকভাবে দাঁড়াবে, তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করতাম এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে বিরোধীদের সঙ্গে জিহাদ করতাম। কেননা তিনি হলেন একজন ন্যায় পরায়ণ শাসক। কিন্তু আমি ভয় করছি, লোকেরা তাঁকে অপমান করবে যেমন, তারা অপমান করেছিল তাঁর পিতাকে। তবে আমি তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করব যাতে তিনি শক্তিশালী হয়ে তাঁর বিরোধীদের সাথে লড়বেন। এরপর তিনি তাঁর দূতকে বললেন, আপনি যায়দ ইবন 'আলীর কাছে আমার এ অপারগতা ব্যাখ্যা করবেন। এ অনুরোধ জানিয়ে তিনি এ দূতের মাধ্যমে দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।'

এরপর কারদারী আরো লিখেছেন, যালিম শাসকের বিরুদ্ধে হযরত যায়িদ ইবন 'আলীর বিদ্রোহকে তিনি কীভাবে দেখছেন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ইমাম সাহেব জবাবে বলেন,

خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

'যালিম শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর এই বিদ্রোহে বের হওয়া রাসূলের বদর যুদ্ধে গমন করার মতোই।' অতঃপর ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সরাসরি তাঁর সাথে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করলেন না কেন? তিনি বললেন, আমার কাছে মানুষের কিছু আমানত রয়েছে, যা আমি ইবনু আবী লায়লাকে দিতে চাইলাম কিন্তু সে সম্মত হলো না। ফলে আমি মানুষের এ আমানতকে অজ্ঞাত রেখে মরে যাওয়া সমীচীন হবে না মনে করে তার এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারলাম না। তিনি যতবার যায়িদ ইবন 'আলীর কথা স্মরণ করতেন ততবার কাঁদতেন।[৫৬]

অনুরূপভাবে মানসূরের বিরুদ্ধে *নাফসে যাকিয়্যাহর* বিদ্রোহে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহ.) সক্রিয়ভাবে তাদেরকে সাহায্য করেন। তিনি এ যুদ্ধকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা দেন।[৫৭]

হাম্বলী মাযহাবের খ্যাতনামা ফকীহ্ ইবনু 'আকীল ও ইবনুল জাওযীর মতে, ফাসিক ও যালিম ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জায়িয। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন।[৫৮]

---

[৫৬] আল কারদারী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬০।
[৫৭] *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, ৭১-৭২; *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৮।

ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর মতে, ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। তবে ফাসিক ও যালিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুধু বৈধ-ই নয়; বরং তা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। আর এ আন্দোলন কারীদেরকে *বিদ্রোহী* নামে আখ্যা দেয়া যাবে না। বিদ্রোহী বলে তখনই আখ্যা দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে, যখন তারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে শরী'য়াত পরিপন্থি কোন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করবে। যেমন, হযরত আবূ বকরের (রা.) খিলাফতকালে যাকাত অস্বীকার কারী দল। এদের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কিনা এ নিয়ে হযরত উমার (রা.)-এর মনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ব্যাখ্যা শুনে তাঁর এ সন্দেহ দূরীভূত হয়। এরপর হযরত আবূ বকর (রা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের এ বিদ্রোহ দমন করেন।[৫৯]

ইমাম মালিকের মতে, বিদ্রোহীরা যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে ইমামের পক্ষালম্বন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ।[৬০] কাযী আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী ইমাম মালিকের এ উক্তিটি উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেন যে,

إذا خرج على ألامام العدول خارج وجب الدفع عنه مثل عمربن عبد العزيز فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما قال الله تعالى (فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً)[৬১]

'যদি 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তাঁর চেয়ে ভিন্নতর কোন ইমাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, তাকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তা'য়ালা অপর কোন যালিম দ্বারা তাকে শাস্তি দিবেন এবং তৃতীয় কোন যালিম দ্বারা তাদের উভয়কে আবার শাস্তি দিবেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেন,

فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً[৬২]

---

[৫৮] *আল-ইনসাফ*, ১০ম খণ্ড, বাবু কিতালি আহলিল বাগী, পৃ. ৪০০; *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৯।

[৫৯] ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্র ১৯৯৬ খ্রী.) পৃ. ৩৬২।

[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৭; *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৭৯।

[৬১] ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৫৩-১৫৪।

'অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সে প্রথম সময় এলো, যখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। এরপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।'

বিদ্রোহী সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাস'আলা

১. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাদের আহতদের উপর আঘাত করা যাবে না, বন্দিদের হত্যা করা যাবে না এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ গনীমাতের মাল হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন,

هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ حَكَمَ اللّٰهُ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؟ قَالَ : اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا وَلَا يُقَسَّمُ فَيْؤُهَا[৬৩]

'হে উম্মে 'আব্দের পুত্র! (ইবন মাস'উদ) উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কী তা জান? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা যাবে না, বন্দিদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে বণ্টন করাও হবে না।'

হযরত 'আলীর (রা.) উষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর ঘোষণা করলেন,[৬৪]

لَا تَتْبَعُوا مُدْبِرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَسِيرًا وَلَا تُدَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُكْشَفُ سِتْرٌ وَلَا يُؤْخَذُ مَالٌ

'পলায়নকারকে পিছু ধাওয়া করো না, আহত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করো না, বন্দিকে হত্যা করো না, তাকে দিগম্বর করোনা এবং ধন সম্পদ লুণ্ঠন করো না।' এ সময় হযরত 'আলীর সেনাদলের কেউ কেউ দাবি করলো যে, বিরোধী ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দাস বানিয়ে বণ্টন করে দেয়া হোক। হযরত 'আলী (রা.) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন, فمن يأخذ منكم عائشة 'তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশাকে (রা.) তার নিজের অংশে নিতে চায়?' এরপর তিনি বললেন,

---

[৬২] সূরাহ আল-ইসরা: ৫।

[৬৩] ইমাম হাকেম, *আল-মুস্তাদরাক*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ২৭৬, হাদীস নং- ২৭১০।

[৬৪] *আল মাবসূত*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৭।

أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ ثُمَّ تَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا تَسْتَحِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَئِنْ فَعَلْتُمْ لَقَدْ كَفَرْتُمْ .[৬৫]

'তোমরা কি তোমাদের মাতা হযরত 'আয়িশাকে বন্দি করে অন্যান্য রমনীদের মত তাকে হালাল মনে করতে চাও? তবে যদি তোমরা এরূপ মনে করে থাকো তাহলে তোমরা নিশ্চয় কুফরী করলে।' হযরত 'আলী (রা.) তাদেরকে তাদের এরূপ অনৈতিক চাওয়ার প্রেক্ষিতে ধমকস্বরূপ এ কথা বলেছিলেন।[৬৬]

২. বিদ্রোহীদের অর্থ-সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় কিংবা বাড়ীতে থাকে এবং সম্পদের মালিক জীবিত হোক বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং সৈন্যদের মধ্যে বণ্টনও করা যাবে না।[৬৭] এ প্রসঙ্গে তাফসীর আল-মাযহারীতে কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী লিখেছেন যে, যদি বিদ্রোহীদের নিকট থেকে ছিনিয়ে আনা হাতিয়ার দ্বারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় তাহলে ইমামের লোকদের জন্য তা বৈধ। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে বিদ্রোহীদের বাহনের উপর আরোহণ করেও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে। ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমদের (র) মাযহাব এর বিপরীত। তাঁদের মতে, বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করা বৈধ নয়। হানাফীদের উক্তির দলীল সেই রিওয়ায়াত, যা ইব্ন আবী শায়বা 'মুসান্নাফ'-গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনুল হানাফিয়্যাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে,[৬৮] ان عليا قسم يوم الجمل فى العسكر ما اجابوا عليه من سلاح أو كراع. 'হযরত 'আলী (রা.) উষ্ট্রের যুদ্ধে যে বাহনে (সব উট ও ঘোড়ার উপর) আরোহণ করে বিদ্রোহীরা এসেছিল এবং যে সব অস্ত্রশস্ত্র তারা ব্যবহার করেছিল, (বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর) সেগুলো তাঁর সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।' 'হিদায়া' প্রণেতা এ প্রসঙ্গে বলেন,

أن عليا رض قسم السلاح فيم بين أصحابه بالبصرة وكان قسمته للحامة لا للتمليك

'হযরত 'আলী (রা.) বসরায় তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহীদের অস্ত্র-শস্ত্র বণ্টন করেছিলেন। তাঁর এ বণ্টন ছিল ব্যবহার করার জন্য, মালিক বানানোর জন্য নয়।'[৬৯] কেননা 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বিজেতা বাহিনী বা খলীফা

[৬৫] *আহকামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯।
[৬৬] *আল মাবসূত*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৭।
[৬৭] *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮০।
[৬৮] ইবনু আবী শায়বাহ্, *আল-মুসান্নাফ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭১৮।
[৬৯] *আল-হিদায়াহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৩।

বিদ্রোহীদের মালের মালিক হতে পারেন না।'[৭০] তবে যে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী নয়। যুদ্ধ শেষ হলে এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দেয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন যদি হস্তগত হয় তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে কিন্তু এগুলোকে বিজয়ীদের মালিকানাভুক্ত করে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা যাবে না। পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আশঙ্কা না থাকলে ঐ সব জিনিসও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফের মতে সরকার ঐ সব সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য করতে পারবেন।[৭১]

৩. বিদ্রোহীরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্র ক্রয় করে এবং লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয় তাহলে তাদের অনিষ্টরোধ করার জন্য ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে ধরপাকড় ও বন্দি করতে পারবেন, যাতে তারা বিদ্রোহ থেকে বিরত হয় এবং তাওবা করে। আর যদি বিদ্রোহীদের সংগঠন খুব মজবুত হয় এবং পুনআক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাদের হামলা রোধের জন্য তাদের আহতদের উপর আক্রমণ এবং পলায়নকারীদেরকে পিছু ধাওয়া করা যাবে, যাতে তারা পুনরায় দলে গিয়ে যোগ না দিতে পারে। পক্ষান্তরে যদি তাদের সংঘবদ্ধ কোন দল না থাকে তাহলে তাদের আহতদেরকে আক্রমণ করা অথবা হত্যা করা এবং পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, কোন অবস্থায় বিদ্রোহীদের আহতদের উপর আক্রমণ করা যাবে না এবং পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না।[৭২]

৪. বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যে সব বিচারালয় কায়েম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শরী'য়াত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহী হলেও তাদেরকে বহাল রাখা হবে। আর যদি তাদের ফায়সালা শরী'য়াতসম্মত না হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে সরকারের বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করা হয় তাহলে তাদের ফায়সালাসমূহ বহাল রাখা হবে না এবং বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়সমূহের পক্ষ থেকে জারী করা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না।[৭৩]

৫. যদি কোনো বিদ্রোহী খলীফার কোনো ভক্তকে হত্যা করে এবং দাবি করে যে, আমার এ হত্যাকাণ্ড ন্যায্য হয়েছে, তবে হন্তা নিহতের ওয়ারিছ হবে। আর যদি সে তার ভুল স্বীকার করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফের মতে ওয়ারিছ হবে না। আর ইমাম শাফি'ঈ (র.)-এর মতে বিদ্রোহী ন্যায়পন্থীর ওয়ারিছ হবে না, তার হত্যাকাণ্ড সঠিক হোক কিংবা বেঠিক। অপরদিকে যদি খলীফার কোনো ভক্ত

---

[৭০] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭-১৮।

[৭১] *আল মাবসূত*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৭: *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

[৭২] *আল-হিদায়াহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮২; *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; *দুররুল মুখতার*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৫; *আল-বিনায়াহ্*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪১।

[৭৩] *আল মাবসূত*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩০-১৩৫: তাফহীমূল কুরআন, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮১।

কোনো বিদ্রোহীকে হত্যা করে, তবে 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হন্তা নিহতের ওয়ারিছ হবে।[৭৪]

৬. 'আলিমদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে, বিদ্রোহীদের স্ত্রী-পুত্রদেরকে দাসদাসী করা যাবে না। তাদের মালপত্রও গনীমত হিসেবে বণ্টন করা যাবে না; বরং তাদের মালপত্র ক্রোক করা যাবে এবং তাওবা না করা পর্যন্ত তা আটকে রাখা যাবে।[৭৫] ইব্‌ন আবী শায়বা (র.) বলেন, আলী (রা.) যখন তালহা (রা.) ও তাঁর সাথীদেরকে পরাজিত করেন, তখন তিনি এক ঘোষণাকারীকে এ মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, এখন না সামনে দিয়ে আগমনকারীকে হত্যা করা হবে, না পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদেরকে। অর্থাৎ পরাজিত করার পর এই ঘোষণা করানো হয় যে, কারো দরজা খোলা হবে না। কারো লজ্জাস্থান হালাল ভাবা যাবে না। কারো মালামালও *মালে গনীমত* মনে করা যাবে না।[৭৬]

৭. নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা হারাম। কেননা এটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এটিকে *মুছলা* বলা হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। যদিও তা হিংস্র কামড়ানী কুকুরের মাথা হয়। আর হযরত 'আলী (রা.) বিদ্রোহ দমনে এরূপ কোন কাজ করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিদ্রোহ দমন নীতি আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য।[৭৭] এক রোমান পাদ্রীর মাথা কেটে হযরত আবূ বকরের (রা.) কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,

ان الفرس والروم يفعلون ذلك فقال لسنا من الفرس ولا الروم يكفينا الكتاب والخبر[৭৮]

'রোমান ও ইরানীদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্ই যথেষ্ট।'

৮. যুদ্ধ চলাকালীন সময় বিদ্রোহীদের যেসব প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যুদ্ধ শেষ এবং বিজিত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার কোন কিসাস বা ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর বর্তাবে না। ফিতনা ও দাঙ্গা যাতে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য কোন নিহতের প্রতিশোধ গ্রহণ করাও যাবে না। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক লড়াইয়ে এ নীতিমালা-ই অনুসৃত হয়।[৭৯]

---

[৭৪] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

[৭৫] আল-মাবসূত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৭; ফাতহুল কাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

[৭৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৪।

[৭৭] মূল ভাষ্য হলো: وأكره ان تؤخذ رؤسهم فيطاف بها فى الأفاق لأنه مثلة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور ولأنه لم يبالغنا أن عليا صنع ذلك شئ من حروبه وهو المتبع فى الباب দ্র. আল মাবসূত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।

[৭৮] *প্রাগুক্ত*।

[৭৯] মূল ভাষ্য হলো: ومن العدل ألايطالبوا بما جرى بينهم من دم ولامال فإنه تلف على تأويل وفى طلبهم له تنفير لهم عن الصلح واستشراء فى البغي وهذا أصل فى المصلحة দ্র. ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল* কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

সাধারণ মানুষের সাথে মুমিনের আচরণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

অনুবাদ

১১. হে ঈমানদারগণ! পুরুষেরা যেন অন্য পুরুষদেরকে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারা যেন অন্য মহিলাদেরকে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকোনা। ঈমান গ্রহণের পর গোনাহের কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। আর যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই যালিম।

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা পরিত্যাগ কর। কারণ কিছু কিছু ধারণা গোনাহ্। তোমরা দোষ অন্বেষণ করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পরচর্চা ও পরনিন্দা না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী এবং দয়ার্দ্র।

১৩. হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য যে অধিক তাকওয়াবান সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সকল বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا يَسْخَرْ বাক্যটি سخرية এর ক্রিয়ারূপ। এর অর্থ হলো, অবজ্ঞা করা, ছোট মনে করা, তিরস্কার করা এবং কাউকে ঘৃণা করা। এটি কথা, কর্ম ও ইঙ্গিত দ্বারা হয়ে থাকে। قوم দল বা গোষ্ঠী। এখানে قوم দ্বারা পুরুষদের বুঝানো হয়েছে মহিলাদেরকে নয়। কারণ মহিলাদের উপর কেবল পুরুষদের কর্তৃত্ব বর্তে। وَلَا تَلْمِزُوا বাক্য اللمز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো, দোষারোপ করা। এটি ইশারা, ইঙ্গিত ও হাত দ্বারাও হতে পারে। وَلَا تَنَابَزُوا শব্দটি نبز থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, মন্দ বা খারাপ নামে

ডাকা। আর এ শব্দ কেবল খারাপ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, কাউকে ফাসিক, কাফির, মুনাফিক, গাদ্দার ইত্যাদি নামে ডাকা। بِئْسَ নিকৃষ্ট, জঘন্য, খারাপ الاِسْمُ। নাম এখানে اسم। দ্বারা খ্যাতি লাভ করা বুঝানো হয়েছে। যেমন, বলা হয়ে থাকে, অমুক নাম করেছে। এর অর্থ হলো, খ্যাতি লাভ করেছে বা বিখ্যাত হয়েছে। الْفُسُوْقُ দুষ্কার্য, কুকর্ম। وَمَن لَّمْ يَتُبْ যে বিরত থাকে না এই নিষেধাজ্ঞা থেকে। فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ঐসব লোক-ই যালিম।

اجْتَنِبُوا। তোমরা বিরত থাকো, বর্জন কর, দূরে থাকো। كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ। অত্যধিক ধারণা পোষণ করা থেকে। الظَّنِّ। প্রত্যয় জ্ঞান ও সন্দেহের মধ্যে সীমারেখা। কোন চিহ্ন, ইশারা বা ইঙ্গিত অথবা পূর্বাভাস থেকে মানবমনে সৃষ্ট অনুমানকে الظَّنِّ। বলা হয়। إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ। নিশ্চয় কিছু ধারণা গোনাহের কাজ। অর্থাৎ কিছু কিছু অমূলক ধারণা মানুষকে পাপের অংশীদার বানিয়ে দেয় এবং শাস্তিযোগ্য করে। وَلَا تَجَسَّسُوا। তোমরা দোষ খোঁজ কর না التجسس। শব্দের অর্থ হলো, গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা, মানুষের নিকট যা অজ্ঞাত তা প্রকাশ করা। وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا গীবত করবে না তোমাদের কেউ কারোর। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করাকে গীবত বলা হয়। فَكَرِهْتُمُوهُ তোমরা তা ঘৃণা কর। শব্দটি মূলতঃ كره থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো, অপছন্দ করা, খারাপ মনে করা, ঘৃণা করা ইত্যাদি। قَبَائِلَ শব্দটি বহুবচন, একবচনে قبيلة। এর অর্থ হলো, গোত্র। আরবী ভাষায় قبيلة শব্দটি شعب-এর অধস্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবদের নিকট বংশীয় স্তর বিন্যাস হলো, যথাক্রমে কাবিলাহ (قبيلة) শা'ব (شعب), বাতান (بطن), ফাখ্য (فخذ), 'ইমারাহ্ (عمارة), ফুসায়লা (فصيلة) ও আশীরাহ্ (عشيرة)। (لِتَعَارَفُوا) যেন তোমরা পারস্পরিক পরিচিতি লাভ কর। إِنَّ أَكْرَمَكُمْ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত। عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ আল্লাহর নিকট, তোমাদের মধ্যে যিনি অধিক তাকওয়ার অধিকারী। التقوى। শব্দের অর্থ হলো, ভয়ভীতি, আল্লাহভীরুতা, আল্লাহর নির্দেশনাবলীর প্রতিপালন এবং নিষেধাজ্ঞা বর্জন।

শানে নুযূল

১১ নং আয়াত

এক. ইমাম বাগাবী (রহ) হযরত ইবন 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ছাবিত ইবন কায়স ইবন সাম্মাস কানে কম শুনতেন। তাই তিনি রাসূল (সা.)-এর মজলিসে আসলে অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁকে সামনে বসার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতেন। যাতে তিনি রাসূল (সা.)-এর বাণী শুনতে পান। একদিন তিনি ফজরের সালাত এক

রাকা'য়াত ধরতে পারলেন। অবশিষ্ট আরেক রাকায়াত নামায শেষ করে তিনি সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য উঠলেন। এমনি সময়ে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় সকল সাহাবী নামায শেষে স্ব-স্ব স্থানে বসে রইলেন। লোকজনের ভীড়ে জায়গা এতই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে যে, সাহাবীগণ নিজেকে কুঞ্চিত করে অন্যের জন্য বসার জায়গা বের করতে পারছিলেন না। অনেকেই বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় ছাবিত ইবন কায়স লোকদের ঘাড় ডিঙ্গাতে ডিঙ্গাতে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং লোকদের বলতে লাগলেন, একটু জায়গা দিন। লোকেরা তাঁকে দেখে কুঞ্চিত হয়ে তাঁর জন্য স্থান ছেড়ে দিতে লাগলো। এভাবে তিনি রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পরিশেষে দেখা গেল তাঁর ও রাসূলের মাঝে একজন সাহাবীর ব্যবধান। হযরত ছাবিত ইবন কায়স তাঁকেও বললেন, আমাকে একটু জায়গা দিন। ঐ ব্যক্তি বলল, আপনি জায়গাতো পেয়ে গিয়েছেন। এখানেই বসুন। ছাবিত (রা.)ক্রোধের সাথে সেখানে বসে পড়লেন কিন্তু বিষয়টি তাঁকে বারবার পীড়া দিতে লাগল। অতঃপর অন্ধকার যখন দূর হয়ে আলো দেখা দিল তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে রে? সে বলল, আমি অমুক ব্যক্তি। হযরত ছাবিত (রা.) বললেন, অমুক মেয়ের ছেলে! তিনি তার মাতৃদোষ উল্লেখ করলেন যা জাহিলী যুগে উপহাস করে তাকে বলা হতো। এতে এ ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে রাখল। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

দুই. ইমাম দাহ্হাক বলেন, لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ আয়াতটি তামীম গোত্রের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা নিস্ব সাহাবী যেমন, 'আম্মার (রা.), খাব্বাব (রা.), ইবনু ফুহায়রা, বেলাল (রা.), সুয়াইব, সালমান ও সালিম (রা.) সম্পর্কে উপহাস করত। তাদের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে কটুক্তি করত। অতঃপর তামীম গোত্রের লোকদের এই উপহাসের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিলেন তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২]

---

[১] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৫; *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮১; আত-তাফসীরুল মাযহারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮; আবূল বারাকাত 'আব্দুল্লাহ আন-নাসাফী, তাফসীরুন নাসাফী, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ২০৭।

[২] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

তিন. কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতটি 'ইকরামাহ ইবন আবী জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। যখন তিনি মুসলমান হয়ে মদীনায় গমন করেন তখন মুসলমানরা তাঁকে দেখা মাত্র "এ উম্মতের ফির'আউনের ছেলে" বলতে শুরু করে। অতঃপর তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৩]

চার. হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সাফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াই ইবন আখতাব রাসূল (সা.)কে অভিযোগ করে বললেন, মহিলারা আমাকে ইহুদীর মেয়ে বলে গালি দেয়। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি তাদেরকে একথা বললে না কেন? আমার পিতা হারুন, চাচা হলেন মূসা (আ.)। আর আমার স্বামী হলেন, মুহাম্মদ (সা.)। তখন এ আয়াত (وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء) অবতীর্ণ হয়।[৪]

কোন কোন মুফাসসির বলেন, আয়াতটি নবী সহধর্মিনী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা একবার হযরত উম্মু সালমাকে (রা.) বেঁটে বলে উপহাস করেছিল।[৫]

পাঁচ. (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) আবূ জুবায়রাহ্ ইবন দাহ্হাক সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কোন একজনের দু'তিনটি নাম ছিল। এ নামগুলোর কোন একটি নাম ধরে তাকে ডাকলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তখন আয়াতটি নাযিল হয়। ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনাকে হাসান হিসেবে গণ্য করেন।[৬] ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা.) কোন এক ব্যক্তিকে তার জাহিলী যুগের নাম ধরে ডাকলেন। নবী করীম কে (সা.) বলা হলো, হে আল্লাহ রাসূল। আপনি তাকে এ নাম ধরে ডাকায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৭]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, (وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا) আয়াতটি সালমাহ্ গোত্রের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সা.) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন, এ গোত্রের লোকদের অনেকেরই একাধিক নাম রয়েছে। তিনি কোন সময় তাদের কাউকে তার তিনটি নামের মধ্যে যে কোন একটি

---

৩ *প্রাগুক্ত*।

৪ *প্রাগুক্ত*।

৫ *প্রাগুক্ত*।

৬ *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন, হাদীস নং ৩২৬৮।

৭ *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৪৯।

নাম ধরে ডাকলে তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ নাম ধরে ডাকার কারণে লোকটি রাগান্বিত হয়েছে, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৮]

১২ নং আয়াতের শানে নুযূল

ইমাম বাগাবী (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) যখন কোন জিহাদ বা সফরে যেতেন তখন এক-একজন গরীব লোককে দুই-দুইজন মালদার বা ধনী লোকের খিদমতের জন্য নিয়োগ করতেন এবং দুজন ধনী ব্যক্তির সাথে তৃতীয় গরীব লোককে মিলিত করে দিতেন। উক্ত গরীব খাদিম আগে গিয়ে সে দুজন ধনী লোকের যাত্রা বিরতিস্থল নির্ধারণ ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। একবার হযরত সালমান ফারিসীকে (রা.) দুজন লোকের খাদিম নিয়োগ করা হলে তিনি আগে গিয়ে কোন এক যাত্রা বিরতিস্থলে পৌঁছেন এবং তাঁর দায়িত্বে দু'জন সাথীর জন্য খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা না করে শুয়ে পড়েন। যখন তাঁর দু'জন সাথী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, তখন তিনি বললেন, আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম তাই কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। তারা বললেন, এখন তুমি রাসূল (সা.)-এর কাছে যাও এবং তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্য কিছু খাবার চেয়ে আন। তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট খাবার চাইলে তিনি (সা.) বললেন, তুমি উসামা ইবন যায়েদের নিকট গিয়ে বলো, যদি কোন খাবার অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে তোমাকে দিয়ে দিবে। উল্লেখ্য যে, হযরত উসামা ইবন যায়েদ রাসূল (সা.)-এর কোষাধ্যক্ষ এবং থাকার ব্যবস্থাপকও ছিলেন। হযরত সালমান ফারিসী হযরত উসামার কাছে গিয়ে খাবার চাইলেন। হযরত উসামা বললেন, আমার কাছে তো কোন খাবার অবশিষ্ট নেই। হযরত সালমান ফারিসী ফিরে এসে সাথীদ্বয়কে উসামা (রা.) বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। সাথীদ্বয় বললেন, উসামার কাছে অবশ্যই খাবার ছিল তিনি কার্পণ্য করে তা দেননি। এরপর হযরত সালমান ফারিসীকে (রা.) আরেকদল সাহাবীদের নিকট খাদ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হলো কিন্তু সেখানেও কিছু খাদ্য পাওয়া গেল না। হযরত সালমান ফারিসী (রা.) ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসলেন। সাথীদ্বয় হযরত সালমানকে (রা.) বললেন, আমরা যদি তোমাকে প্রবাহমান কোন কুপে পানি আনতে পাঠাই তবে

---

[৮] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৮৪৯; সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ্, হাদীস নং- ২৫৬৩।

তাও শুকিয়ে যাবে। এরপর তারা (সাথীদ্বয়) বিষয়টি তদন্ত করার জন্য হযরত উসামা (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং জানতে পারলেন যে, রাসূল (সা.)উসামাকে (রা.) অবশিষ্ট খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু কোন খাদ্য না থাকায় তিনি তা দিতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি কোনরূপ কার্পণ্যতার আশ্রয় নেননি। এরপর উক্ত সাথীদ্বয় রাসূল (সা.)- এর নিকট আসলেন। তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে বললেন, কী ব্যাপার তোমাদের মুখ থেকে গোশতের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আজ সারাদিনে কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তিনি (সা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমরা তো সালমান ও উসামার গোশত ভক্ষণ করেছ। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[৯]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

ইবনুল মুনযির, ইবন জুরায়জ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا আয়াতটি সম্ভবতঃ হযরত সালমান ফারিসীর (রা.) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি একদা খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। এসময় কোন এক ব্যক্তি তাঁর খাওয়া ও ঘুমানোর সমালোচনা করলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১০]

১৩ নং আয়াতের শানে-নযূল

ইবনু আবী হাতিম ইবনু আবী মূলায়কা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন বেলাল (রা.) রাসূল (সা.)-এর নির্দেশক্রমে কা'বা ঘরের ছাদের উপর উঠে আযান দেন। এতে কিছু সংখ্যক লোক সমালোচনা করে বলল এই কালো গোলামকে দিয়ে আযান দেয়ার কি দরকার ছিল? ইমাম বাগাবী বলেন, 'আব্বাদ ইবন উসাইদ আযান শুনে বললেন, আল্লাহর শোকর যে, এইদিন দেখার পূর্বে আমার বাবা মারা গেছেন। হারিস ইবন হিশাম বললেন, মুহাম্মদ (সা.) কি ঐ কালো লোকটি ছাড়া আযান দেয়ার জন্য আর কাউকে পেলেন না? সুহাইল ইবন 'আমর বললেন, আল্লাহ ইচ্ছে করলে এই অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। আবূ সুফইয়ান বললেন, আমি মুখে

---

৯ *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬; মুহাম্মদ ইয্যাহ দারওয়াযাহ্, *আত-তাফসীরুল হাদীস*, ৮ম খণ্ড (কায়রো: দারু ইহ্ইয়ায়িল কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ, ২০০০ খ্রী.) পৃ. ৫১৫; *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১।

১০ *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড. পৃ. ১৪৪।

কিছু বলব না। আমি আশঙ্কা করছি আমার মুখ থেকে যা বের হবে, আকাশের রব্ব তা মুহাম্মদকে (সা.) জানিয়ে দেবেন। এ সময় হযরত জিবরীল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে তাদের এ সমালোচনাগুলো রাসূল (সা.)কে জানিয়ে দিলেন। এরপর রাসূল (সা.) তাদেরকে ডাকলেন এবং তারা হযরত বেলাল (রা.) সম্পর্কে যে সব কথা বলাবলি করছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারা তাদের কথাগুলো স্বীকার করতে বাধ্য হলো। তখন আল্লাহ তা'য়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে বংশগত অহমিকা, ধনাঢ্যতার অহংকার এবং গরীবদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে নিষেধ করে বললেন,[১১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[১২]

ইবনু 'আসাকির স্বীয় *মুবহামাত* গ্রন্থে ইবনু বিশকালের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আয়াতটি আবূ হিন্দ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূল (সা.) বায়াযা গোত্রের লোকদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা তোমাদের গোত্রের কোন এক মহিলার সাথে আবূ হিন্দকে বিয়ে দাও। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের গোত্রের মেয়েদেরকে আমাদের আযাদকৃত গোলাদের সাথে বিয়ে করিয়ে দিচ্ছেন? তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১৩]

তাফসীর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

(হে ঈমানদারগণ! পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদেরকে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারা যেন অন্য মহিলাদেরকে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা এদের চেয়ে উত্তম। এ আয়াতে উল্লিখিত قوم শব্দ দ্বারা পুরুষদেরকে বুঝানো হয়েছে।[১৪] আরবী ভাষায় সাধারণতঃ قوم দ্বারা নারীদের দলকে বুঝানো হয় না। 'আল্লামা জাওহারী এ মতকে গ্রহণ করেছেন এবং এ আয়াতকে স্বীয় মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। অপর দিকে কোন কোন মুফাসসির আল-কুরআনে

---

[১১] *প্রাগুক্ত*।

[১২] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৫০; *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৮

[১৩] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৫০।

[১৪] *তাফসীরুল কাশ্শাফ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৫।

বর্ণিত আয়াত সমূহে قوم শব্দ দ্বারা পুরুষ ও নারী সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে বলে মনে করেন। কেননা শব্দটি নিছক পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত হলেও আনুষঙ্গিকভাবে এ শব্দের মধ্যে নারীরাও শামিল রয়েছে। যদি এখানে قوم শব্দ দ্বারা নারী ও পুরুষকে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ বাক্য উল্লেখ করার কারণ কী? এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, প্রথমে পুরুষের প্রতি পুরুষের উপহাস করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং পরবর্তীতে নারীর প্রতি নারীর উপহাস করার বিষয়টি আনুষাঙ্গিকভাবে এসেছে। কেননা নারীরা তাদের স্বল্প বুদ্ধি ও অজ্ঞতার কারণে অধিকাংশ সময় একে অন্যকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে থাকে।[১৫]

অত্র আয়াত দ্বারা ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উপহাস করা সকল ঈমানদারের জন্য হারাম করা হয়েছে। ঠাট্টা বিদ্রূপের ফলে মানুষের মর্যাদার হানি হয়। এছাড়া আল-কুরআন যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে সমাজ হবে উন্নতমানের কৃষ্টি ও সু-আচরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সেখানে থাকবে না মর্যাদায় আঘাত সৃষ্টিকারী কোন কু-আচরণ। সে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি এমন মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে যা অলঙ্ঘনীয়। ব্যক্তির সম্মান তার চোখে সমষ্টির সম্মানেরই অংশ এবং ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ ও অসদাচরণ সমষ্টির প্রতি অসদাচরণেরই অংশ। এ জন্য এ আয়াতে নারী পুরুষ উভয়কে পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা যাকে বিদ্রূপ করা হয় সে আল্লাহর দৃষ্টিতে বিদ্রূপকারী অথবা বিদ্রূপকারিণীর চেয়ে ভালো হতে পারে।[১৬]

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না। ঈমান লাভের পর গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া জঘন্য অপরাধ। যারা এ কাজ পরিত্যাগ করেনি তারাই যালিম।) অর্থাৎ তোমরা কোন মানুষকে অযথা কথা, কাজ এবং ইঙ্গিতের মাধ্যমে ও দোষারোপ করো না। মু'মিনদেরকে দোষারোপ করার অর্থ হলো, নিজকে দোষারোপ করা। কেননা প্রত্যেক মু'মিন একক সত্তায় গ্রথিত। সুতরাং কেউ যদি স্বীয় দ্বীনি ভাইকে দোষারোপ করে সে যেন নিজকে দোষারোপ করল। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ[১৭] 'তোমরা

---

[১৫] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯।

[১৬] *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪৪।

[১৭] সূরাহ্ আন-নিসা: ২৯।

নিজেদেরকে হত্যা করো না।' হযরত নু'মান ইবন বাশীর রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সা.) বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ[১৮]

'সকল মু'মিন এক ব্যক্তিতুল্য। যদি তার মাথাব্যথা হয়, তখন তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা অনুভুত হয়। যদি তার চোখে ব্যথা লাগে তখন তার সকল অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হয়।'

অনুরূপভাবে কাউকে মন্দ নামে ডাকাও অত্র আয়াত দ্বারা হারাম করা হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত تنابز শব্দের অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করল এরপর তাওবা করল কিন্তু লোকেরা তার অতীত অপকর্মের জন্য তাকে লজ্জা দিলো। এ বাক্যে এরূপ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটি গাল মন্দেরই নামান্তর। রাসূল (সা.) কাউকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ[১৯]

'কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী কাজ। আর তার সাথে মারামারি নিষেধ করা হয়েছে।' এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ইমাম বাগাবী (রহ.) 'ইকরামা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইকরামা) বলেন, تنابز بالالقاب বলা হয়, কেউ কাউকে বললো, হে ফাসিক! হে মুনাফিক! হে কাফির! হযরত হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ইসলাম গ্রহণ করত। তারপর কিছু মুসলমান তাদেরকে বলত, হে ইহুদী! হে খ্রীষ্টান।[২০] অনুরূপভাবে কাউকে হে গাধা! হে শুকর! ইত্যাদি খারাপ নামে ডাকাকে হারাম করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ[২১]

'-কেউ যদি কারো প্রতি ফিস্ক বা কুফর শব্দ আরোপ করে আর সে যদি এরূপ না হয় তা হলে একথাটি তার উপর বর্তাবে অর্থাৎ গালিদাতা ফাসিক বা কাফির হয়ে যাবে।'

---

[১৮] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ্, হাদীস নং ৬৫৮৯।

[১৯] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৭০৭৬, পৃ. ১২১৯।

[২০] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫; *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ূন*, ৫ম খণ্ড পৃ. ৩৩৩; *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

[২১] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৬০৪৩।

মোট কথা, ঈমান আনার পর কাউকে এরূপ মন্দ নামে গালি দেয়া অথবা ডাকা অতি মন্দকাজ। এরূপ মন্দনামে ডাকা বা গালি দেয়ার পর উক্ত গালিদাতা যদি তাওবা না করে সে যালিম হিসেবে গণ্য হবে এবং ইসলামী শরী'য়াত অনুযায়ী তার উপর সামাজিক শাস্তি আরোপ করা হবে। বিখ্যাত ফকীহ্ ইবনুল হুমাম লিখেছেন, রাসূলের যুগে এক ব্যক্তি কাউকে *হে মুখান্নাস* বলেছিল, রাসূল (সা.) তার উপর তা'যীর[২২] জারী করেন।[২৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ধারণা বা অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ কিছু কিছু ধারণা বা অনুমান পাপ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।) এ আয়াতে একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং খুব বেশী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অনেক ধারণা গোনাহের পর্যায়ে পড়ে। এজন্য হাদীসে এরূপ কু-ধারণাকে বর্জন করতে বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ[২৪]

"তোমরা ধারণা বা অনুমানকে পরিহার কর। কেননা ধারণা মিথ্যায় পর্যবশিত হয়ে থাকে।"

এ আয়াতে খারাপ ধারণার নোংরামি থেকে মানুষের মনকে পবিত্র করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে সে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া এবং সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এভাবে ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মানুষের মনে শুধু তার ভাই-এর প্রতি ভালোবাসা সংশয়হীনতা ও পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি বিরাজ করবে। যাবতীয় কুধারণামুক্ত একটি সমাজ জীবন যে কত শান্তিময় ও আনন্দময় হতে পারে তা সত্যিই অভাবনীয়। মানুষের হৃদয় ও বিবেককে ইসলাম শুধু যে কুধারণামুক্ত থাকার প্রশিক্ষণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকছে তা নয়; বরং এই শিক্ষাকে সামাজিক আচরণের ভিত্তি এবং একটি পরিচ্ছন্ন সমাজে সহাবস্থানের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সমাজের কাউকে নিছক ধারণার বশে পাকড়াও করা যাবে না।

---

[২২] তা'যীর: العقوبة التى يقودها القاضى لجريمة معينة غير الحدود দ্রষ্টব্য: *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, পৃ. ১৩৬।

[২৩] *তাফসীরে মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২০।

[২৪] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৬০৬৪, পৃ. ১০৫৯।

সন্দেহের বশে বিচারে সোপর্দ করা যাবে না। ধারণা ও অনুমানকে বিচারের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এমনকি ধারণার ভিত্তিতে তদন্তেও অগ্রসর হওয়া যাবে না। রাসূল (সা.) বলেছেন, إذا ظننت فلا تحقق 'যখন তুমি কোন ধারণা পোষণ করবে তখন তদন্ত চালাবে না।'[২৫] অর্থাৎ মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা ও সম্মান সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরাপদ থাকবে, যতক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হয় যে, সে সেই কাজটি সত্যিই করেছে, যার জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কাউকে তদন্তের শিকার করতে নিছক ধারণা ও অনুমান যথেষ্ট নয়; বরং আনুষ্ঠানিক অভিযোগও আবশ্যক। এ আয়াতগুলোতে মানুষের অধিকার ও মর্যাদাকে কত ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা ভাবতে অবাক লাগে। আজকের পৃথিবীতে যে সব দেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষিত, তাতে কুরআনে নির্দেশিত ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপ কতটুকু প্রতিষ্ঠিত এবং তারও আগে মুসলিম গণমানসে, বিবেকে ও চেতনায় জাগ্রত এই মানবাধিকারের কতটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে?[২৬]

وَلَا تَجَسَّسُوا (তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না।) আয়াতে উল্লিখিত تجسس শব্দের অর্থ হলো, গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা, দোষ খুঁজে বের করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা অপরের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না এবং তাদের সুপ্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য তৎপর হবে না। আল্লাহ্ যখন তাদের দোষত্রুটি ঢেকে রেখেছেন তখন তোমরা তা উন্মোচন করো না। আল-কুরআনের এ নির্দেশনার পাশাপাশি হাদীসেও অপরের ছিদ্রান্বেষণ বা গোপন ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি একটি অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলার বন্ধন বিনষ্ট হয় এবং নানা রকম ফিতনা ফাসাদের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ[২৭]

---

[২৫] ইবনুল জাওযী, *গারীবুল হাদীস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭; *জামি'উল আহাদীস*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; কানযুল 'উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

[২৬] *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪৫।

[২৭] *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ্, হাদীস নং ২০৩২, পৃ. ৪৬৮।

'হে সেই লোক! যে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছ অথচ ঈমান তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিওনা এবং তাদের নিন্দা করনা। তাদের সুপ্ত বিষয় অবগত হওয়ার জন্য তৎপর হয়োনা। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাই- এর সুপ্ত বিষয় জানার জন্য তৎপর হয় আল্লাহ্ তার সুপ্ত বিষয় ফাঁস করার জন্য তৎপর হবেন। তাকে তিনি অপদস্থ করবেন, যদিও সে উষ্ট্রের হাওদার মধ্যে অবস্থান করে।'

দোষক্রটি অনুসন্ধান না করার নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্য নয়; বরং এটি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের জন্যও। ইসলামী শরী'য়াত *নাহী 'আনিল মুনকারের* (মন্দ কাজের প্রতিরোধ) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবি এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ক্রটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে; বরং যে সব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তারা শক্তি প্রয়োগ করবে। গোপনীয় দোষ-ক্রটি ও খারাপ চাল-চলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়; বরং শিক্ষা, ওয়ায-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে 'উমরের (রা.) নিম্নোক্ত ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে,

'একবার রাতের বেলা হযরত 'উমার (রা.) কোন এক ব্যক্তির উচ্চ কণ্ঠে গান শুনতে পেলেন। এরপর তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন, সেখানে শরাব প্রস্তুত এবং তার সাথে এক নারীও অবস্থান করছে। এতদ্দর্শনে হযরত 'উমর (রা.) চিৎকার করে বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন! তুই মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? সে উত্তরে বললো, আমীরুল মু'মিনীন! তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গোনাহ্ করে থাকি, তবে আপনি তিনটি গোনাহ করছেন। **এক.** আল্লাহ্ তা'য়ালা দোষ-ক্রটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ক্রটি খুঁজছেন। **দুই.** আল্লাহ্ দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। **তিন.** আল্লাহ্ অন্যের ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন। এ জবাব শুনে 'উমর (রা.) নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে কল্যাণের পথ অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি নিলেন।[২৮]

---

[২৮] সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮৮-৮৯।

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়িয নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে অপরাধ তদন্তকারী সংস্থাকে মানুষের উপর গোয়েন্দাগিরি পরিচালনা করার অধিকার দেয়া হয়নি। মানুষকে বাইর থেকে যেমন, মনে হয়, তেমনই থাকতে দিতে হবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া যাবে না। প্রকাশ্য অপরাধ বা বিদ্রোহ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কোনরূপ অনুমান বা আশঙ্কার ভিত্তিতেও পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। এমনকি গোপনে কেউ কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করে জানা গেলেও তার ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে তাকে আটক করা বা বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাবে না। নাগরিকদের কোন অপরাধ প্রকাশিত ও সঙ্ঘটিত হলেই কেবল তাকে গ্রেফতার করা যাবে, তবে সে ক্ষেত্রেও তার জন্য যে সব নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে তা লঙ্ঘন করা চলবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ[২৯]

যায়েদ ইবন ওয়াহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা ইবন মাস'উদ (রা.)-কে বলা হয়েছিল যে, অমুকের দাড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা মদ টপকাতে দেখা গেছে। তিনি বললেন, 'আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোন অপরাধ প্রকাশিত হয়ে পড়লে আমরা তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।'[৩০]

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

(তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণা করবে।)

এ আয়াতে গীবত বা পরনিন্দা ও পরচর্চা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা গীবত একটি সামাজিক ব্যাধি। এর ফলে সমাজের স্থিতিশীলতা ও ঐক্য বিনষ্ট হয়। পারস্পারিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ধ্বংস হয়। সমাজ জীবনে নেমে আসে অশান্তির ঘোর অমানিশা। কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয়। রাসূল (সা.) স্বয়ং গীবতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে

---

[২৯] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৯০, পৃ. ৬৯০।

[৩০] *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪৬।

اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك اخاك بما يكره افرأيت ان كان فى أخى ما اقول

তোমরা কি জানো, গীবত কী? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো বিষয় আলোচনা কর, যা তার অপছন্দনীয়, তাহলে সেটিই গীবত। বলা হলো, আমি আমার ভাইয়ের যে দোষ আলোচনা করলাম তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবু কি তা গীবত হবে? তিনি বললেন,

اذا قلت فى الرجل ما فيه فقد اغتبته وان قلت ما ليس فيه فقد بهته

'তুমি যা বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।'[৩১]

হযরত 'আমর ইব্‌ন শু'আইব তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সামনে লোকেরা জনৈক ব্যক্তির কথা আলোচনা করল এবং বলল, যে পর্যন্ত তাকে খাওয়ানো না হয়, সে খায় না এবং যে পর্যন্ত তাকে সওয়ার না করা হয় সে সওয়ার হয় না। নবী (সা.) বললেন, তোমরা তো তার গীবত করলে। তারা বললেন, আমরা তো তা-ই বললাম, যা তার মধ্যে আছে। তিনি বললেন, গীবত হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তোমরা যা বলেছো, তা তার মধ্যে আছে।[৩২]

এরপর গীবত করার কদর্যতার বিকট চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এ আয়াতে। সেটি হলো, এ কাজটিকে এমন জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, যা অপছন্দনীয় ও কদর্য। অর্থাৎ মানুষের গোশত। আর মানুষও এমন মানুষ, যে সম্পর্কে ভাই হয় এবং মৃত ভাই। মুজাহিদ বলেন, যখন أن يحب احدكم বলা হলো, তখন যেন তাদের পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আমরা তো তা পছন্দ করতে পারি না। তখন তাদেরকে বলা হলো, যখন তোমরা তা অপছন্দ করছো, তাহলে নিজের ভাইয়ের পেছনে বসে তার সমালোচনাও করবে না।[৩৩]

গীবতের ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন,

---

[৩১] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ্, হাদীস নং ৬৫৯৩, পৃ. ১১৩২।

[৩২] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

[৩৩] *প্রাগুক্ত*।

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا[৩৪]

'রাসূল (সা.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এ দু'টি কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। অথচ কোন বড় গুনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এ দু'জনের একজন প্রস্রাব করার সময় পর্দা করতো না অপর জন পরনিন্দা করে বেড়াতো। এরপর তিনি তাজা একটি ডাল ভেঙ্গে দু'ভাগ করে দু'টি কবরের উপর পুতে-দিলেন এবং বললেন, যত দিন পর্যন্ত এ দু'টি ডাল না শুকাবে তত দিন পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব লাঘব করা হবে।'

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

আমাকে যখন মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি এমন কিছু লোকের কাছ দিয়ে গমন করেছিলাম যাদের নখ ছিল তামার। আর সেই নখ দ্বারা তারা তাদের চেহারা ও গোশত আঁচড়াচ্ছিল। আমি বললাম, এরা কারা? (জিবরীল) বললেন, এরা হলো সে সব লোক, যারা মানুষের গোশত খেত। তাদের অগোচরে সামালোচনা করে তাদের সম্মান হানি করত।[৩৫]

উপরিউক্ত হাদীসে গীবতের কর্দযতার যে চিত্র অংকিত হয়েছে তা খুবই মারাত্মক। এজন্য ইসলামী শরী'য়াতে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর মধ্যে গীবত একটি নিকৃষ্টতম বস্তু হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। গীবত করার কারণে নিন্দুক ব্যক্তি যেমন সামাজিকভাবে অধপতিত হয় তেমন আখিরাতে রয়েছে তার জন্য শাস্তি। তাই গীবত ব্যধি থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হবে গীবতকারীর গীবতে অংশগ্রহণ না করা, তার কথায় শায় না দেয়া এবং আনন্দ অনুভব না করা। কেননা

---

[৩৪] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২১৮, পৃ. ৪১।

[৩৫] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৭; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৪২৩৫; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ১২৮৬১।

গীবত শ্রবণকারী গীবত কারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে শ্রবণকারী যদি গীবতকারীর কথার প্রতিবাদ করে তাহলে সে দোষী হবে না। যদি শ্রবণকারী মুখে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না রাখে তাহলে নিন্দাকারীকে অন্তর দিয়ে অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে। অন্যথায় সে দোষী হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন المستمع شريك المغتابين[৩৬] 'গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' তিনি (সা.) আরো বলেন,

من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره اذله الله يرم القيامة على رؤس الخلائق[৩৭]

'কোন মু'মিন যদি কারো সামনে অপমানিত হয় এবং তাকে সাহায্য করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে সে সাহায্য না করে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্ট জীবের সামনে অপমান করবেন।'

রাসূল (সা.) আরো বলেন,

من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة[৩৮]

যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভ্রাতার সম্মান তার অসাক্ষাতে রক্ষা করে, কিয়ামতের দিন তার সম্মান রক্ষা করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।'

হযরত 'উমার (রা.) বলেন,

إياكم وذكر الناس فإنه داء وعليكم بذكر الله فإنه شفاء[৩৯]

'তোমরা মানুষের সমালোচনা পরিহার কর। কেননা এটি ব্যাধি তুল্য। তোমাদের জন্য আল্লাহর স্মরণ অত্যন্ত জরুরী। এটি রোগ নিরাময়কারী।'

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুল কারী এবং দয়ালু।) অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে যে বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আল্লাহকে ভয় কর এবং

---

৩৬ আব্দুর রঊফ আল-মানাবী, *ফয়যুল কাদীর*, ৩য় খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ্, তাবি), পৃ. ২০৫।

৩৭ ইবনু রজব আল-হাম্বলী, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩১৩; আশ-শওকানী, *নায়লুল আওতার*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৭৩খ্রী.), পৃ. ৭৬।

৩৮ *সুনানুত তিরমিযী*, হাদীস নং- ১৯৩১।

৩৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী', *আহকামুল কুরআন*, পৃ. ২৮৮।

গীবতকে ঘৃণিত ও নোংরা কাজ মনে করে তা থেকে দূরে থাকো। আর পরনিন্দা বা গীবত থেকে যদি তোমরা তাওবা কর এবং পুনরায় তাতে যদি লিপ্ত না হও তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ তাওবা কবূলকারী ও দয়ালু।[৪০]

ইমাম গাযালী (রহ.) লিখেছেন যে, গীবতের পাপ থেকে মুক্তি লাভের দু'টি উপায় আছে। একটি হলো, নিন্দুক ব্যক্তি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করবে এবং এ মন্দ কাজের জন্য দু:খ প্রকাশ করবে। দ্বিতীয় উপায় হলো, নিন্দুক ব্যক্তি নিন্দিত ব্যক্তির নিকট নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং সে একাজের জন্য অনুতপ্ত ও দু:খ প্রকাশ করবে। হযরত হাসান বাসরী (র.) বলেন, 'নিন্দিত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, যাকে নিন্দা করা হয়েছে নিন্দুক ব্যক্তি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেই নিন্দা করার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।'[৪১] হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

من كفارة الغيبة أن يستغفر لمن اغتباه ويقول اللهم اغفرلنا وله[৪২]

'গীবতের কাফফারা হচ্ছে, যার গীবত করা হয় তার জন্য ইসতিগফার করা এবং এই বলা যে, হে আল্লাহ আমাকে ও তাকে ক্ষমা কর।'

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

আয়াতটির পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারগণকে বারবার সম্বোধন করে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নত রীতিনীতি শিক্ষাদান, তাদের সম্মান, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান এবং তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এরপর এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে তাদের মর্যাদার মানদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, ধর্ম-বর্ণ, বংশ-নির্বিশেষে সকল মানুষের মূল যে এক ও অভিন্ন, তাদের মর্যাদা নিরূপণের মানদণ্ড যে এক ও অভিন্ন এবং এটিই যে ইসলামী সমাজের ভিত্তি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

---

৪০ *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬ খণ্ড, পৃ: ২৫৮

৪১ ইমাম আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ দ্বীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৬২-১৬৩।

৪২ *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৩; যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, হাদীস নং ৯০৮।

হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে পরিণত করেছি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, এতে তোমাদের ঐক্য হবে সুদৃঢ় এবং তোমাদের পারস্পরিক পরিচিত হবে সহজ। এক্ষেত্রে বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যের কোন স্থান নেই; বরং *তাকওয়া* হলো কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। মানব জাতিকে সকল বর্ণ, বংশ, গোত্রভিত্তিক সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য এ মাপকাঠিকে ইসলাম সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কেননা জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা জাহিলিয়াত থেকে উৎসারিত। এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।[৪৩] তাই রাসূল (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন,

كلكم من بنى آدم وآدم خلق من تراب ولاينتهين قوم يفخرون بأبائهم أوليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان[৪৪]

'তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আদম হলো মাটির সৃষ্টি। আর যারা তাদের পিতৃপুরুষ নিয়ে গর্বিত, তাদের সংযত হওয়া উচিৎ। নচেৎ আল্লাহর কাছে তারা গুবরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্টতর বলে গণ্য হবে।'

রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর কাসওয়া উটনীর উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করলেন এবং তাঁর সূচালো ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। তিনি (লোকজনের সমাগমের কারণে) বাইরে উটনী বাঁধার স্থান পেলেন না। তাই তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর হামদ ও ছানা পাঠ করলেন এবং বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ ان الله عز وجل يقول (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) ثم قال صلى الله عليه وسلم أقول قولى هذا استغفر الله لى ولكم.

'হে মানব মণ্ডলী! নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের থেকে জাহিলী যুগের গর্ব অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকার। এক. নেককার, যারা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। দুই. যারা বদকার তারা আল্লাহর নিকট অপদস্থ। আল্লাহ বলেন, হে

---

[৪৩] *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪৮।

[৪৪] আল-বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২৯৩৮, *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ৫১১৬।

মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে এক নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতির জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে পরিণত করেছি। এরপর তিনি (সা.) বললেন, আমি আমার একথাগুলো বলছি এবং আমার নিজের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'[৪৫]

ছোট্ট এ আয়াতে সাম্যবাদের ভিত স্থাপিত হয়েছে। আয়াতের বর্ণনাধারা এটিই প্রমাণ করে যে, জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। তাদের সৃষ্টিকর্তা একজন, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম পদ্ধতি এক ও অভিন্ন এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। একথাই রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের দিনে তাঁর ভাষণে পরিব্যক্ত করেন এভাবে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ آلا هل بلغت قالوا بلى يارسول الله فقال لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.[৪৬]

'হে লোকজন সাবধান! তোমাদের রব্ব একজন। কোন অনারবের উপর কোন আরবের এবং কোন আরবের উপর কোন অনারবের, কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের ও কোন শেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? সবাই বললো, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! এরপর রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।'

ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, كرم الدنيا الغني وكرم الأخرة التقوي 'ধনাঢ্যতা দুনিয়ার সম্মান আর আখিরাতের সম্মান হলো তাকওয়া।'[৪৭]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ

---

[৪৫] *সুনানুত তিরমিযী*, আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন, পৃ. ৭৪৩, হাদীস নং ৩২৭০।

[৪৬] ইমাম মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান আল-মাগরিবী, *জাম'উল ফাওয়ায়িদ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারু ইবন হাযম, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৩১; ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-২২৩৯১।

[৪৭] *তাফসীরুল খাযিন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.

'একদা রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে অধিক আল্লাহভীরু। সাহাবীগণ বললেন, আমরাতো আপনাকে এ প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তাহলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ইউসূফ (আ.)। কেননা তাঁর পিতা ছিলেন আল্লাহর নবী ইয়াকূব (আ.), তিনি ছিলেন ইসহাকের পুত্র, ইসহাক ছিলেন আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীমের পুত্র। সাহাবীগণ বললেন, আমরা আপনাকে এ প্রশ্নও করিনি। তিনি (সা.) বললেন, তাহলে কি তোমরা আমাকে আরবদের শ্রেষ্ঠ বংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করছ? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলীযুগে উৎকৃষ্ট ছিল ইসলামেও তারা উৎকৃষ্ট যদি, তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে থাকে।'[৪৮]

দূররা বিনত আবী লাহাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের (সা.) নিকট আসলো। এসময় রাসূল (সা.) মিম্বরে উপবেশন করছিলেন। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট? তিনি (সা.) বললেন,

خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم.[৪৯]

'মানুষের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে অধিক তিলাওয়াতকারী এবং আল্লাহ্ জন্য অধিক ভীতু, সৎ কাজের আর্দেশদাতা, অসৎ কাজের নিষেধকারী এবং আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায়কারী।'

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন,

إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادى ألا أني جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبى وأضع نسبكم أين المتقون.[৫০]

---

[৪৮] সহীহুল বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, বাব: قول الله تعالى (لقد كان فى يوسف واخواته ايات للسائلين), হাদীস নং- ৩৩৮৩, পৃ. ৫৬৬।

[৪৯] *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৬।

[৫০] *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫।

'আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারীকে এমর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিবেন যে, সে বলবে হে মানবজাতি! আমি তোমাদের জন্য একটি বংশ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। আর তোমরা এর বিপরীত একটি নসব নির্ধারণ করেছিলে। আমি তোমাদের মধ্যে যে বেশী তাকওয়াধারী, তাকে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছিলাম, তোমরা তা অস্বীকার করে বলতে অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ। আজকে আমি আমার নির্ধারিত বংশকে সুউচ্চ করছি। আর তোমাদের বানানো বংশকে অবনত করছি। মুত্তাকীরা কোথায়?'

রাসূল (সা.) আরো বলেন,

ان الله لا يسئلكم عن احسابكم ولا عن انسابكم يوم القيامة ان اكرمكم عند الله اتقكم.[৫১]

'নিশ্চয় আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহ্ভীরু সে-ই আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।'

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে যে বক্তব্য বিধৃত হয়েছে তা শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ইসলাম মুসলমানদেরকে এ শিক্ষার মাধ্যমে এক ভ্রাতৃ সংঘে পরিণত করে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে নেই কোন বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ। যেখানে উচ্চ নীচ, বংশ কৌলিণ্যতা ও আভিজাত্যের কোন স্থান নেই। যেখানে সকল গোষ্ঠীর মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম বিরোধীরাও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন ধর্ম ও আদর্শে কখনো এর কোন তুলনা পাওয়া যায় না। একমাত্র ইসলামই সে আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মানবগোষ্ঠীকে মিলিয়ে এক জাতি বানিয়ে দিয়েছে।[৫২]

শর'ঈ আহ্কাম

এক. উপর্যুক্ত প্রথম আয়াতে তিনটি জিনিসকে হারাম করা হয়েছে। তা হলো, উপহাস করা, বিদ্রুপ ও কুৎসা রটনা করা এবং কাউকে মন্দ নামে ডাকা। এরূপ

---

[৫১] তাফসীর আল-তাবারী, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[৫২] *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৯৯।

নিষিদ্ধ কাজ কেউ করলে সে ফাসিক ও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে আখিরাতে আযাবের সম্মুখীন হবে। তাওবা না করা পর্যন্ত তার এই কৃত গুনাহ্ মার্জনীয় হবে না। কেননা হাসি তামাশা উপহাস কটাক্ষ করা, বিদ্রুপ ও কুৎসা রটনার পেছনে নিজেদের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরকে অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর হয়ে থাকে, যা নৈতিকভাবে জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া অন্যের মনোকষ্ট হওয়ায় এর মাধ্যমে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এজন্য এ কাজগুলোকে হারাম করা হয়েছে।

মন্দ নামে কাউকে ডাকা হারাম করার কারণ হলো এই যে, এতে ব্যক্তির অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন, কাউকে ফাসিক, মুনাফিক, কাফির, খোঁড়া, অন্ধ ও কানা বলা। অথবা কাউকে তার নিজের কিংবা মা-বাবার কিংবা বংশের কোন দোষ ত্রুটির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে ডাকা। তবে যে সব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয় বরং পরিচয়ের সহায়ক হিসেবে ঐসব উপাধি ব্যবহার করা হয় তাহলে এগুলো এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। যেমন, মুহাদ্দিসগণ রিজাল গ্রন্থসমূহে এসব উপাধি ব্যবহার করেছেন। তারা এ সমস্ত উপাধি দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করেছেন। যেমন, তারা উল্লেখ করেছেন *সুলায়মান আল-'আমাশ* (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং *ওয়াসিল আল-আহদাব* (কুঁজো ওয়াসিল) ইত্যাদি। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোন উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে।[৫৩] যেমন, *'আব্দুল্লাহ* নামে যদি কয়েকজন লোক থাকে তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনার সুবিধার জন্য *অন্ধ 'আব্দুল্লাহ* বলা যেতে পারে। অনুরূপভাবে এমন সব উপাধি বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যিকভাবে অমর্যাদা বুঝায় না। যদি ভালবেসে অথবা স্নেহবশত: কিছু উপাধি কিংবা উপনামে ডাকা হয় এবং আহুত ব্যক্তিও তা পছন্দ করে তাহলে এগুলো এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। যেমন, *আবূ হুরায়রা* এবং *আবূত তুরাব* ইত্যাদি।[৫৪] অপর দিকে ভাল উপাধি দেয়া বা ভাল উপনামে ডাকা দুষনীয় নয়। যেমন, *সিদ্দীক, ফারুক, যুননূরাইন, যুশ শাহাদাতাইন, যুল ইয়াদাইন, আসাদুল্লাহ, সাইফুল্লাহ* ইত্যাদি উপাধিতে ডাকা বা কাউকে প্রদান করা বৈধ, যা

---

[৫৩] *তাফহীমুল কুরআন*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৮৫।

[৫৪] *প্রাগুক্ত*।

'আরব ও অনারবীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে।[৫৫] এ বিষয়ে 'আল্লামা যামাখশারী একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বলেছেন,[৫৬]

من حق المؤمن على المؤمن أن يسمه بأحب أسمائه إليه

একজন মু'মিনের উপর আরেকজন মু'মিনের হক হলো তার নামগুলোর মধ্য থেকে প্রিয় নামে ডাকা।

দুই. উপর্যুক্ত দু'নম্বর আয়াতে তিনটি বিষয়কে হারাম করা হয়েছে। ১. খারাপ ধারণা পোষণ ২. ছিদ্রান্বেষণ ৩. গীবতা বা পরনিন্দা।

১. ধারণা পোষণ

আয়াতে الظن শব্দ দ্বারা ধারণাকে পোষণ বুঝানো হয়েছে। এতে বেশী বেশী ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ظن শব্দের অর্থ হলো যা দৃঢ় বিশ্বাস নয়। চাই তার অস্তিত্বের দিক প্রবল হোক বা না হোক। ظن অনেক প্রকার হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কোনটি জায়িয আবার কোনটি হারাম। যেমনঃ

ওয়াজিব ধারণা (ظن واجب)ঃ এ প্রকার ধারণা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দ্বীনের দৃষ্টিতে কাম্য ও প্রশংসিত। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা।[৫৭] যেমন, হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي 'আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণার সাথেই আমি রয়েছি।'[৫৮] রাসূল (সা.) আরো বলেন, لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'তোমাদের মধ্যে কেউ আমানতদার হতে পারে যদি না সে আল্লাহর ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করে।'[৫৯] রাসূল (সা.) আরো বলেন, حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ ভাল ধারণা ভাল 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।'[৬০]

---

৫৫ *তাফসীরুল কাশ্শাফ* ৪র্থ খণ্ড, (কায়রোঃ মাকতাবাতু মিসর, তাবি), পৃ. ২৫৭; *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৬১।

৫৬ *তাফসীরুল কাশ্শাফ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

৫৭ *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৬১।

৫৮ *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত তাওহীদ, বাবুঃ কাওলুহু তা'য়ালা (ويحذركم الله نفسه) হাদীস নং ৭৪০৫।

৫৯ *সহীহ মুসলিম*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং- ২৮৭৭, পৃ. ২২০৬; *সুনানু আবী দাউদ*, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং- ৩১২৩, পৃ. ১৮৯;

৬০ ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদীস নং- ৭৯৪৩; *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৬২।

নিষিদ্ধ ধারণা (ظن محظور أو حرام)ঃ আল্লাহ ও ঈমানদার ব্যক্তিদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা অথবা বিনা কারণে কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার সময় খারাপ ধারণার উপর ভিত্তি করেই শুরু করা অথবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্টাচার হওয়া প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির কোন কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান সম্ভাবনা থাকে তবে ধারণার বশবর্তী হয়ে তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম বা গোনাহের কাজ।[৬১] রাসূল (সা.) বলেছেন,

إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن ظن السوء[৬২]

'নিশ্চয় আল্লাহ একজন মুসলমানের রক্ত, সম্মান এবং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করাকে হারাম করেছেন।'

এ প্রসঙ্গে হযরত 'আয়িশা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

من أساء بأخيه الظن فقد أساء الظن بربه إن الله تعالى يقول اجتنبوا كثير من الظن[৬৩]

'যে স্বীয় ভাই এর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে সে তার রব্ব এর ব্যাপারেও খারাপ ধারণা পোষণ করল। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন তোমরা বেশী বেশী ধারণা পরিত্যাগ কর।' আর যদি ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় অথবা এমন কোন স্বভাব দেখা দেয় যা ভাল নয় সে ক্ষেত্রে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম হবে না।

মানদূব ধারণা (ظن مندوب)ঃ যেমন, কোন মুসলিম ভাই সম্পর্কে সাধারণভাবে কারণ ছাড়া ভাল ধারণা পোষণ করা অথবা প্রয়োজন নেই তারপরেও তার চাল চলন ও কাজ কর্মে এমন কিছু লক্ষণ ফুটে উঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না এ রূপ ক্ষেত্রে খারাপ ধারণা পোষণ করাকে মানদূব ধারণা বলা হয়।[৬৪]

মুবাহ ধারণা (ظن مباح) ঃ যেমন, শরী'য়াতের ফুরু'ঈ আহকাম উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভিত্তিতে ধারণা করা অথবা সন্দেহের ক্ষেত্রে ধারণার প্রাবল্যতার উপর

---

[৬১] আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৭।

[৬২] *প্রাগুক্ত* ; ইবনু 'আবদিল বার্‌র, আত-তামহীদ, ১৮শ খণ্ড (মরক্কো: ওয়াযারাতু 'উমূমিল আওকাফ, ১৩৮৬হি.), পৃ. ১৩৮৬।

[৬৩] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ: ২৬৩।

[৬৪] *প্রাগুক্ত*।

'আমল করা। যেমন, কেউ সালাত আদায়কালে ধারণা করে বসলো যে, সে তিন রাকা'য়াত না চার রাকা'য়াত সালাত আদায় করল।[৬৫]

২. তাজাস্‌সুস (التجسس)

দোষক্রটি গুপ্তচর বৃত্তি করা সাধারণ ভাবে হারাম। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে খোঁজখবর নেয়া, অনুসন্ধান করা বা গুপ্তচরবৃত্তি করা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত হবে না। এছাড়া কোন ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার বা তাদের প্রচ্ছন্ন দোষক্রটি অনুসন্ধান করা অথবা ন্যায় পরায়ণ শাসক যা সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করা হারাম। আয়াতে এধরণের কাজকে নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এছাড়া রাসূল (সা.) বলেছেন,

وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ[৬৬]

'তোমরা তাদের দোষক্রটি খুঁজোনা। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ খুঁজে আল্লাহ তার দোষ খুঁজবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষক্রটি প্রকাশ করেন সে তার বাহনে বসে থাকলেও তাকে চরম অপমানিত করে থাকেন।'

৩. গীবত বা পরচর্চা (الغيبة)

গীবত বা পরনিন্দা করা হারাম। এটি কবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'য়াতের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে, তাকে গীবত বলা হয়। সা'দী আবূ জীব গীবতের সংজ্ঞাদানে বলেন,

أن تذكرأخاك من ورائه من عيوب يسترها ويسؤه ذكرها فإن كان صدقا سمي غيبة وان كان كذبا سمى بهتانا[৬৭]

'কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার কোন গোপনীয় দোষ বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয়। তার এ দোষ যদি সত্য হয় তাহলে সেটা গীবত হবে। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে সেটা অপবাদ বলে গণ্য হবে।'

---

[৬৫] *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

[৬৬] *সুনানু আবী দাউদ*, কিতাবুল আদাব, পৃ. ৬৮৮, হাদীস নং ৪৮৮০।

[৬৭] *আল-কামূসুল ফিকহী*, পৃ. ২৮০।

ইমাম নববী (রহ.) গীবতের সংজ্ঞাদানে লিখেছেন,

الغيبة هي ذكرك الانسان بما فيه مما يكره سواء كان في بدنه أودينه أو دينه أو ديناه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده.[৬৮]

'গীবত হলো, মানুষের এমন বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। এ আলোচনা তার শরীর, দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে হতে পারে; কিংবা তার ব্যক্তিগত, চারিত্রিক, আকৃতি ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি বিষয়কেন্দ্রিক হতে পারে।'

স্বয়ং রাসূল (সা.) গীবতের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন তিনি (সা.) বলেন,

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ[৬৯]

গীবত হলো, তোমার ভাইয়ের এমন কিছু বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো আমি যা বলছি তা যদি সত্যিই আমার ভাইয়ের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে কী হবে? এর জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, তুমি যা বলছ যদিও তা তার মধ্যে থেকে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি মিথ্যাচার করলে এবং তাকে অপবাদ দিলে।'

এ হাদীসে রাসূল (সা.) أخاك '*তোমার ভাই*' শব্দ ব্যবহার করে একথার প্রতি ইংগিত করেছেন যে, তুমি যার গীবত করছ সে তোমার নিকট আত্মীয় না হলেও মূলতঃ সে তোমার দ্বীনী ভাই। কেননা তোমার ও তার আদি পিতা এবং মাতা হলেন একই। তুমি ও সে উভয়েই মুসলমান। আর সকল মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। অতএব সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে অন্যদের গীবত করা থেকে সেরূপ বিরত থাকা উচিৎ।[৭০]

গীবত করা হারাম হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'য়াতে এর বৈধ পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমাম গাযালী ও আল্লামা আব্দুল হাই লাখনোভী গীবতের কয়েকটি বৈধ পন্থা উল্লেখ করেছেন।[৭১] সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নরূপ:

---

[৬৮] ইমাম নববী, *কিতাবুল আযকার* (জেদ্দা: কিন্দা লিল 'ইলাম ওয়ান নাশ্‌র, তাবি), পৃ. ২৯৪।

[৬৯] *প্রাগুক্ত*, হাদীস ৪৮৭৪; *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ্‌, হাদীস নং- ১৯৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং, ২৫৮৯।

[৭০] 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাখনবী, গীবত, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী.) পৃ. ৬।

[৭১] ইমাম আল গাযালী, *ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১৬১-১৬২; আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী, *গীবত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩-৩১।

এক. কোন ব্যক্তি বিচারকের সামনে কারো বিরুদ্ধে অত্যাচার, বিশ্বাস ভঙ্গ এবং ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ করে গীবত করলে তা বৈধ হবে। এর মাধ্যমে সে রাজ-দরবারে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবে। কারণ রাজ-দরবারে যালিমের গীবত না করলে সে প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। তবে যদি সে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত না হয় তাহলে এ জন্য সে নিন্দুক ও গোনাহ্‌গার হবে। উপরন্তু নালিশের কারণে শাসনকর্তা যালিম কর্মকর্তাকে অপসারণ করে তদস্থলে ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন এবং ফলে নিরীহ লোকেরা যুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا[৭২] 'যার স্বত্ব আছে, তার কথা বলারও অধিকার আছে।' তিনি আরো বলেন, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ[৭৩] 'হক আদায়ে ধনীর বিলম্ব করা অত্যাচার স্বরূপ।' তিনি আরো বলেন, لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ[৭৪] 'ঋণ আদায় না করলে ধনী লোককে শাস্তি দেয়া ও তার সম্মান নষ্ট করা বৈধ হয়ে যায়।'

বিখ্যাত তাবি'ঈ শো'বা (র.) বলেন, الشكاية والتحذير ليسا من الغيبة 'যালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অথবা কোন পাপাচারী সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করা গীবত নয়।[৭৫] এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ[৭৬]

'মুখে খারাপ কথা বলা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির বিষয় আলাদা।'

ইমাম বায়হাকী সুফইয়ান ইবন উয়ায়নাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

ثلاثة ليست لهم غيبة الامام الجائر والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع الذى يدعو الناس الى بدعته[৭৭]

---

[৭২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং- ৪৯৫।

[৭৩] *সুনানু আবী দাউদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৫৩; *সুনানুত তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২।

[৭৪] *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; *সুনানু ইবন মাজাহ্*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১১।

[৭৫] *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ, ১২০।

[৭৬] সূরাহ্ আন-নিসা: ১৪৮।

'তিন ব্যক্তির সমালোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অত্যাচারী শাসক, ঘোষণা দিয়ে দুষ্কর্মে লিপ্ত ফাসিক ব্যক্তি এবং ঐ বিদ'আত পন্থি যে, মানুষকে বিদ'আতের দিকে আহ্বান করে।'

দুই. এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়।[৭৮] যেমন, কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন 'আলিম ব্যক্তি তার সাথে উঠাবসা করছে। এ অবস্থায় তার উঠাবসা করার কারণে হয়ত কখনও 'আলিম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এ অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ। অথবা বিচারকের আদালতের কেউ মোকদ্দমা দায়ের করল। বিবাদী সাক্ষীগণের মিথ্যাচার, দোষত্রুটি ও অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। এ অবস্থায় আদালতের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া বিবাদীর জন্য বৈধ।[৭৯]

তিন. মানুষকে পাপাচার বা তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোন জীবিত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। এ ধরণের গীবতের উদ্দেশ্য হলো, পাপাচার থেকে মানুষকে বিরত রাখা।[৮০] যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

'রাসূল (সা.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এ দু'টি কবরবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। অথচ কোন বড় গুনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এ দু'জনের একজন প্রস্রাব করার সময় পর্দা করতো না

---

[৭৭] *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ, ১২০।

[৭৮] *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন*, পৃ. ১৬১; *রদ্দুল মুহতার*, পৃ. ২২৬; *শারহু সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২।

[৭৯] মওলানা আব্দুল হাই লাখনবী, *গীবত*, পৃ. ২৮-২৯; *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন*, পৃ. ১৬১-১৬২।

[৮০] আব্দুল হাই লাখনবী, *গীবত*, পৃ. ৩১।

অপর জন পরনিন্দা করে বেড়াতো। এরপর তিনি তাজা একটি ডাল ভেঙ্গে দু'ভাগ করে দু'টি কবরের উপর পুতে-দিলেন এবং বললেন, যত দিন পর্যন্ত এ দু'টি ডাল না শুকাবে তত দিন পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব লাঘব করা হবে।'[৮১]

চার. লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার জন্য কারোর গীবত করা বৈধ। যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পাপাচার অন্য লোক জেনেছে মনে করে তা পরিহার করবে। যেমন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি (সা.) তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। তৃতীয় বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে তিনি (সা.) বলেন, তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত হয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে রাসূল (সা.)-এর কথামত নিজের ঘরের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র রাস্তায় নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছলে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[৮২]

পাঁচ. কোন ব্যক্তি কোন পাপাচারে লিপ্ত হলে সে সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে না, যে তাকে উক্ত পাপাচার থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। কারণ এ ধরণের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়।[৮৩] যেমন, বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত 'উমর (রা.) হযরত 'উসমান (রা.)-এর নিকট যাওয়ার কালে হযরত তালহা তাকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না। হযরত 'উমর (রা.) বিষয়টি হযরত আবূ বকর-এর নিকট গিয়ে উল্লেখ করলে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট এসে ব্যাপারটি মীমাংসা করে দিলেন। কিন্তু বিষয়টি তাদের নিকট গীবত বলে গণ্য হয়নি।[৮৪] সিরিয়ার গভর্নর হযরত 'উমার (রা.)-এর নিকট এ মর্মে একটি চিঠি লিখে পাঠান যে, আবূ জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল যে,

---

[৮১] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ওযূ, হাদীস নং ২১৬, পৃ. ৪১।

[৮২] *গীবত*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩-২৭।

[৮৩] *ইহইয়াউ 'উলূমিদীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২; আব্দুল হাই লাখনবী, *গীবত*, পৃ. ২৫।

[৮৪] *প্রাগুক্ত*।

'উমার (রা.) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে মদ পান ছেড়ে দিবে। 'উমার (রা.) আবূ জান্দালকে সতর্ক করে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে লেখা ছিল,

حم ۝ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ[৮৫]

"হা-মীম। এ কিতাব (কুরআন) মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও প্রাচুর্যময়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

আবূ জানদাল পত্র পেয়ে এতে উল্লিখিত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করলেন। কিন্তু হযরত 'উমর (রা.)-এর নিকট যে ব্যক্তি এ সংবাদ দিয়েছিল, তাকে তিনি গীবতের দোষে দোষী করেননি। কেননা তাকে ঐ কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তার উপকার করা উদ্দেশ্য ছিল।[৮৬]

ছয়. শর'ঈ বিধি-বিধান জানার জন্য কারো গর্হিত কাজ উল্লেখ করা সঙ্গত। যেমন, আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর স্ত্রী রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন যে,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ[৮৭]

'হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফইয়ান খুব কৃপণ ব্যক্তি। সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করে না। আমি কি তার অজ্ঞাতে কোন জিনিস ব্যয় করতে পারি? রাসূল (সা.) বললেন যে পরিমাণ সম্পদ তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য প্রয়োজন তা তুমি গ্রহণ করতে পার।' হিন্দা এভাবে তার স্বামীর কৃপণতা ও অত্যাচারের বিষয় জানিয়ে দিলেন; কিন্তু রাসূল (সা.) তাকে পরনিন্দার দোষে দোষী করলেন না। কেননা হিন্দার উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে ফাতওয়া জানা।

---

[৮৫] সূরাহ্ মু'মিন: ১-৪।

[৮৬] *ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২।

[৮৭] *সহীহ বুখারী*, কিতাবুন নাফাকাত, হাদীস নং ৩৫৩৯, পৃ. ৯৫৭।

সাত. কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত থাকলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায পড়ে না অথবা লোকদের উপর যুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই 'আলিমগণ যালিম শাসকের গীবত করেন। এ প্রকারের গীবত বৈধ।[৮৮] দুটি কারণে ফাসিক ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। ১. সে লোকমুখে তার দুর্নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হবে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি ফাসিক, তাকে সালাম করা মাকরূহ। ২. আল্লাহর দৃষ্টিতে ফাসিকের কোন মর্যাদা নেই।[৮৯] এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى و اهتز له العرش[৯০]

"যখন কেউ পাপাচারী ফাসিকের প্রশংসা করে তখন মহান প্রভূ অসন্তুষ্ট হন এবং তার জন্য 'আরশ প্রকম্পিত হয়।"

আট. কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে মনে করে যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা বা নিন্দা করা না হলে ধর্ম বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির ক্ষতি হবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে গীবত করার অনুমতি রয়েছে; তবে এতে ধারণার চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ কম হবে বলে মনে করলেই কেবল সে তা করতে পারবে। অনুরূপভাবে কারোর জীবন বিপন্ন হবার মুখে পড়লে এবং অপর কারোর চরিত্রের দুর্বলতার কথা প্রকাশ এবং প্রকাশ্যে তার সমালোচনা না করলে, এ বিপদ এড়ানো যাবে না মনে হলে, তার জন্য গীবত করা বৈধ।

গীবতকারীর পরিণাম

গীবত করা মহা পাপ। গীবতকারী ব্যক্তি সমাজে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়ে থাকে। আখিরাতেও তার জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।[৯১] এ প্রসঙ্গে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন,

---

[৮৮] ইমাম নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড (দিল্লী: আসাহুল মাতাবি' তাবি), পৃ. ৩২২।

[৮৯] আব্দুল হাই লাখনবী, *গীবত*, পৃ. ২৮।

[৯০] ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব আল-তিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি), বাব হিফজুল-লিসান, পৃ. ৪৪।

[৯১] ফকীহ আবূল লাইস সমরখন্দী, *তাম্বীহুল গাফিলীন* (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৫খ্রী.), পৃ. ১০৫-১০৮।

ليلة أسرى بى إلى السماء مررت بقوم يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه ثم يقال لهم كلوا ما كنتم تأكلون من لحوم إخوانكم فقلت ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الهمازون اللمازون

'যখন আমাকে উর্ধ্বাকাশে উঠানো হল তখন আমি কিছু লোককে অতিক্রম করলাম, তখন তাদের পার্শ্বদেশের গোশত কেটে লোকমা বানিয়ে তাদের বলা হচ্ছে, খাও! যেভাবে তোমরা তোমাদের ভাইদের গোশত কেটে লোকমা বানিয়ে খাচ্ছিলে। এসময় আমি জিবরাঈলকে (আ.) বললাম, এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের মধ্যে যারা গীবতকারী।'[৯২]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين قد اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح المنتنة

'একবার রাসূলের যুগে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুপ্রবাহ শুরু হয়েছিল। তখন রাসূল (সা.) বললেন মুনাফিকরা মুসলমানদের গীবত করেছে। সেজন্য দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।'[৯৩]

গীবতকারীর আচরণের কথা বলতে গিয়ে একদা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা কোন ঘুমন্ত মানুষের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যদি দেখ যে, বাতাসে তার লজ্জাস্থানের কিছু কাপড় খুলে গেছে, তাহলে তোমরা কি তা ঢেকে দেবে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন না; বরং তোমরা অবশিষ্ট কাপড়টুকুও খুলে ফেলবে। তখন তারা অবাক হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ্! এও কি সম্ভব? তিনি বললেন, তোমাদের কাছে কোন লোকের ব্যাপারে আলোচনা হলে তোমরা কি তার খারাপ দিকগুলো আলোচনা কর না? এভাবে তোমরা তার অবশিষ্ট কাপড় খুলে ফেল।[৯৪]

খালিদ রবী (রহ.) রিওয়ায়াত করেন, একদা আমি জামি' মসজিদে ছিলাম। এসময় লোকেরা এক লোকের গীবত করলে আমি তাদের নিষেধ করলাম। তারা তা বন্ধ করে অন্য আলোচনা শুরু করল। তারপর আবার গীবত শুরু করল। এসময় আমিও

---

[৯২] *তাফসীর আল-তাবারী*, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ১৩।
[৯৩] ইমাম আহমাদ, *আস-মুসনাদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১; *আল-আদাবুল মুফরাদ*, পৃ. ৭৩২।
[৯৪] *তাম্বীহুল গাফিলীন*, পৃ. ১০৭।

তাদের সাথে কিছুটা শরীক হলাম। ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ভীষণ কাল দীর্ঘদেহী লোক আমার কাছে এল। তার হাতে শূকরের গোশত ভরা এক হাঁড়ি। সে আমাকে বলল, খাও! আমি বললাম, শূকরের গোশত! আল্লাহর কসম! কিছুতেই আমি এগুলো খাব না। তখন সে আমাকে এক ভয়ানক ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো এর চেয়ে খারাপ গোশত খেয়েছ। তারপর সে তা আমার মুখ চেপে ধরল, এমন সময় আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। খালিদ রবী (রহ.) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, এরপর থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খেলেই মুখে সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ অনুভূত হতো।[৯৫]

গীবতকারীর দু'আ আল্লাহর দরবারে কবূল হয় না। এমন কি তার নেক 'আমল বা সৎকাজও আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এজন্য রাসূল (সা.) সবসময়ই সাহাবীদেরকে গীবত থেকে সতর্ক করতেন। তিনি বলতেন, 'তোমরা গীবত থেকে দূরে অবস্থান করবে। কেননা এতে তিনটি বিপদ রয়েছে। এক. গীবত কারীর দু'আ কবূল হয় না দুই. তার নেক 'আমলও আল্লাহর নিকট কবূল হয় না। তিন. তার (আমল নামায়) পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে।'

---

[৯৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

ঈমানের মূলনীতি

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

অনুবাদ

১৪. মরুচারী লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরসমূহে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর প্রতিফল দানে কোন প্রকার কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৫. প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। এরপর তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ এবং জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী।

১৬. (হে নবী!) বলুন! তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ এই নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তা জানেন। আল্লাহ সকল জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

১৭. এসব লোক আপনাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার উপর করুণা করেছে। আপনি তাদের বলে দিন, ইসলাম গ্রহণ করে তোমরা আমার উপকার করেছ একথা মনে করো না; বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি হিদায়াত করে তোমাদের উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৮. আল্লাহ আসমান ও যমীনের গোপন বিষয় জানেন। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তা দেখছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

(الْأَعْرَابُ) গ্রামের অধিবাসী, মরুচারী ব্যক্তিরা (آمَنَّا) আমরা ঈমান এনেছি। শব্দটি ايمان থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো, আন্তরিক বিশ্বাস। (أَسْلَمْنَا) আমরা প্রকাশ্য

বশ্যতা স্বীকার করেছি। বাহ্যিক আনুগত্য এবং কালেমার মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ইসলাম বলা হয়। وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ এখনো ঈমান সত্যিকার অর্থে তোমাদের অন্তকরণে প্রবেশ করেনি। وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ যদি তোমরা একনিষ্ঠভাবে কপটতা ব্যাতিরেকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। لَا يَلِتْكُم তিনি তোমাদের ব্যাপারে কমতি করবেন না। لَمْ يَرْتَابُوا শব্দটি ريب থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো, কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেকের পূর্বে মানব মনে যা সৃষ্টি হয়। أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ তোমরা কি তোমাদের কথা امنا আমরা ঈমান এনেছি দ্বারা আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণের খবর জানাচ্ছ? يَمُنُّونَ বাক্যটি مَنٌّ থেকে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ হলো, অনুগ্রহ করা, ইহসান করা, খোঁটা দেয়া ইত্যাদি। غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু বা গোপন বিষয়।

১৪ নং আয়াতের শানে নুযূল

এক. আল-ওয়াহিদী সা'ঈদ ইবন জুবাইর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার আসাদ ইবন খোযায়মাহ্ গোত্রের কিছু লোক দুর্ভিক্ষের সময় মদীনায় এসে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, অথচ তারা অন্তরের মাধ্যমে ইসলামকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা আর্থিক সহযোগিতা দাবি করে বারবার রাসূল (সা.)কে বলতে লাগলো, আমরা যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেছি। অমুক অমুক গোত্র যেমন, যুদ্ধ করেছে আমরা আপনার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করিনি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলকে অনুগ্রহ করেছেন একথা বারবার বলতে লাগলো। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন:[১]

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

দুই. ইমাম সুদ্দী বর্ণনা করেন, উল্লিখিত আয়াত জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্রের বেদুইন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এরা নিজেদের জানমাল নিরাপদ রাখার জন্য মুখে امنا বলতো, কিন্তু যখন রাসূল (সা.) তাদেরকে হুদায়বিয়ায় নিয়ে যেতে চাইলেন তখন তারা পশ্চাদপদ অনুসরণ করল। আল্লাহ্

---

[১] আল-ওয়াহিদী, *আসবাবুন নুযূল*, পৃ: ২২৫; *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৯; *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৫।

তা'য়ালা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা মুখে ঈমান আনলেও তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবিষ্ট হয়নি ।[২]

তাফসীর

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

(মরুচারী লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরসমূহে প্রবেশ করেনি ।)

এখানে الْأَعْرَابُ দ্বারা সমস্ত বেদুইনকে বুঝানো হয়নি; বরং কতিপয় বেদুইন গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে মুসলমানদের আঘাত নিরাপদ এবং ইসলামী বিজয় থেকে সুবিধা লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত লোক শুধু ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য মূলকভাবে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উদ্দেশ্যকে ফাঁস করে দিয়েছেন এবং রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরা বাহ্যিকভাবে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছ কিন্তু এখনো তোমরা মনে প্রাণে ঈমান গ্রহণ করনি ।

আয়াতে উল্লিখিত (قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا) বাক্যের বর্ণনা ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস নয়; বরং ঈমান ইসলাম থেকে খাস। বাহ্যিক আত্মসমর্পণকে *ইসলাম* বলা হয় এবং অন্তরের বিশ্বাসকে *ঈমান* বলা হয়। এ অর্থেই হাদীসে মু'মিন ও মুসলিমের প্রভেদ করা হয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী হযরত সা'দ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ[৩]

---

[২] *মা'আলিমুত তানযীল*, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৯; *আত-তাফসীরুল মুনীর*, ২৬শ খণ্ড, পৃ: ২৬৮ ।

[৩] *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৭, পৃ. ৮ ।

'রাসূল (সা.) একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ সেখানে ছিলেন। রাসূল (সা.) একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সে ব্যক্তি ছিল সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমিতো তাকে মু'মিন বলে জানি। তিনি বললেন, না মুসলিম বল। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। এর পর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম, আপনি অমুককে কেন বাদ দিলেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মু'মিন বলে জানি। তিনি বললেন, না মুসলিম বল। এতে আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম এবং রাসূল (সা.) আবার পূর্বের মত জবাব দিলেন। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ! আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়। এ আশঙ্কায় এরূপ করি, যে পাচ্ছে সে কোন গুনাহের কাজ করে বসলে আল্লাহ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দিবেন। হাদীসটি এটিই ইঙ্গিত করে যে, অন্তরে বিশ্বাসীকে মু'মিন বলে। আর বাহ্যিক আত্মসমর্পণ করে ইসলামের কাজ করলে তাকে মুসলিম বলা হয়। একারণেই এখানে নবী (সা.)-এর কথার তাৎপর্য হলো এই যে, তুমি তো তার অন্তরের খবর রাখ না। কাজেই তাকে মু'মিন না বলে মুসলিম বল।

কোন কোন মুফাসসির মনে করেন যে, মু'মিন ও মুসলিম একই জিনিস। আল-কুরআনের অন্যত্র শব্দ দু'টিকে একই অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী :

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ[৪]

'অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। সেখানে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান আমি পাইনি।'

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা সত্যভাবে ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে,

وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[৫]

---

[৪] সূরাহ্ আয-যারিয়াত: ৩৫-৩৬।

[৫] সূরাহ্ আল-হুজুরাত: ১৪।

'যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর পুরস্কার দানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'

পূর্ববর্তী আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তারা আত্মসমর্পণপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমানের স্তরে উন্নীত হয়নি। এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তারা মৌখিকভাবে ঈমান আনলেও ঈমানের প্রকৃত মর্ম তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়নি। তথাপি আল্লাহ নিজ দয়া ও মহানুভবতার গুণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদের দ্বারা যা কিছু সৎকাজ সম্পন্ন হয়েছে, তিনি তার প্রতিদান অবশ্যই দিবেন এবং তাতে তিনি মোটেই কাটছাঁট করবেন না। বাহ্যিক ইসলাম যা অন্তরে বদ্ধমূল হয়নি এবং অনমনীয় ঈমানের রূপ ধারণ করেনি। এরূপ ইসলামও তাদের সৎকাজগুলোকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে এবং কাফিরদের সৎকাজের মত বৃথা যায়নি। তাই একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণভাবে আনুগত্য কর, খালেস ভাবে 'আমল কর তাহলে তোমাদের সৎকাজের কিছুই বিনষ্ট হবে না। এর কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'য়ালা দয়া ও ক্ষমার আঁধার। তিনি বান্দার প্রথম পদক্ষেপটিই গ্রহণ করেন এবং তার আনুগত্য ও আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঈমানের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে এবং সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত হয়।

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

(প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। এরপর তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পদ এবং জীবন দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী।)

এ আয়াতে প্রকৃত ঈমান এবং মু'মিনদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)কে মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অন্তর দ্বারা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের ব্যাপারে কোন সংশয় ও সন্দেহকে মনে স্থান দেয় না। তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে। প্রকৃত পক্ষে এরাই হলো সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী। এ আয়াতে মানুষের মনের ঈমানী তত্ত্বের উপলব্ধি এবং বাস্তব জগতের জীবন ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। চেতনায় ঈমানের

বিদ্যমানরূপ এবং বাইরের জগতে বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার সাথে কোন অসামঞ্জস্যতা ও অসংগতি একজন মুমিনের জন্য অসহনীয় বিষয়। আর এই অসামঞ্জস্যতা তাকে প্রতি মুহূর্তে প্রতিক্ষণে কষ্ট দেয়। এজন্যই জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ জিহাদ আসলে প্রকৃত মুমিনের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। এর মাধ্যমে তার হৃদয়ে ঈমানের দীপ্তিমানরূপকে সমাজ জীবনে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। ফলে তার কাছে বিরাজমান জাহিলী জীবন ধারার বিরোধ সুস্পষ্ট হয়। নিজের ঈমানী চেতনা ও বিশ্বাস এবং বাস্তব জীবনের মাঝে দ্বৈত জীবন যাপনে তার অক্ষমতার কারণেই এই বিরোধের সূত্রপাত হয়। তার ঈমানী চেতনাকে ইসলাম বিরোধী জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাধ্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাই তার মাঝে ও তার আশপাশে জাহিলিয়াতের সাথে তার যুদ্ধ বেধে যাওয়া অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

ঈমান আনার পরেও মনের ভিতরে যে সন্দেহ সংশয় থেকে যাওয়া সম্ভব সে স্পর্শকাতর সত্যটির প্রতি এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ثم لم يرتابوا 'অতঃপর তারা কোন সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হয়নি।' এ উক্তি আল-কুরআনে অন্যত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

"যারা বলেছে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তারা এর উপর অবিচল থেকেছে।"- এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহর প্রতি ঈমানে সংশয়হীনতা ও আল্লাহর প্রভূত্বে অবিচল আস্থা এ দু'টি উক্তি থেকেই বুঝা যায় যে, মুমিনের মনে কখনো কখনো কঠিন অগ্নি পরীক্ষার প্রভাবে কিছুটা সন্দেহ, সংশয়, অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতা দেখা দিতে পারে। মুমিনের মন দুনিয়ার জীবনে বহু কঠিন বিপদ-মুসিবতে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতিতে মনকে স্থির রাখে, আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখে এবং সঠিক পথে অবিচল থাকে তার কোন বিপর্যয় ঘটে না। সন্দেহ সংশয় তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করে থাকে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ আয়াতে إن এর সঙ্গে ما অব্যয়টি যোগ করে حصر তথা নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। তারা সাধারণ নয়।

তাই একমাত্র একনিষ্ঠ মু'মিন যারা তারা-ই এরূপ। এর ব্যাখ্যায় হযরত হাসান বসরীর (রহ.) উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে,

إن رجلا سأله أمؤمن انت؟ قال الإيمن إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألنى عن قوله (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ) فوالله لا أدرى أمنهم انا ام لا.[৬]

'এক ব্যক্তি হযরত হাসানকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মু'মিন? তিনি বললেন, ঈমান দু'প্রকার। যদি তুমি আমাকে আল্লাহ, ফিরিস্তা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত দিবস, জান্নাত-জাহান্নাম, পুনরুত্থান এবং হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকো তাহলে আমি মু'মিন। আর যদি তুমি আল্লাহর বাণী إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকো তা হলে আমি জানিনা যে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত কিনা?।'

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য কি? তারা কারা? নিম্নোক্ত হাদীসে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়। হাদীসটি ইমাম আহমাদ আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন,

المؤمنون فى الدنيا على ثلاثة أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله والذى أمنه الناس على اموالهم وانفسهم ثم الذى إذا أشرف على طمع تركه.[৭]

'মু'মিনরা দুনিয়াতে তিন দলে বিভক্ত। প্রথম দল ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং বিনা সন্দেহে নিজ জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। দ্বিতীয় দল ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে মানুষেরা জানমালের নিরাপত্তা দিয়েছে। তৃতীয় দল হল কোন জিনিসের প্রতি আসক্ত অথবা লোভ সৃষ্টি হলে তা তারা ত্যাগ করে।'

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(বলুন! তোমরা কি তোমাদের দীন সম্পর্কে আল্লাহকে অবহিত করছ? অথচ তিনি আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞাতশীল।)

---

৬ *তাফসীরুল কাশশাফ*, পৃ. ৪০৩।

৭ ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূল (সা.)কে সম্বোধন করে বলেন, হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা آمنا 'আমরা ঈমান আনলাম' বলে যে দ্বীন প্রকাশ করছ তা কি তোমরা আন্তরিকভাবে প্রকাশ করছ না মৌখিকভাবে বলছ? আর অন্তরে তার উল্টো ধারণা পোষণ করছ। জেনে রাখ, তোমরা যা প্রকাশ করছ আর অন্তরে যা গোপন করে রাখছ তা আল্লাহ্ জানেন। মনে রেখো আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এমন কি পৃথিবীতে কোন বৃক্ষের পাতা খসে পড়লেও তিনি তা জানেন। যেমন, আল-কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ[৮]

'তাঁর কাছে রয়েছে অদৃশ্য বিষয়ের চাবিকাঠি। তিনি ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে বৃক্ষের কোন পাতাও ঝড়ে পড়েনা। এমন কি কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকারে পতিত হলে এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হলে তা সব কিছুই প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।' সুতরাং অন্তরে কপটতা গোপন রেখে শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি করলেই ঈমানদার হওয়ার দাবি করা যেমন অযৌক্তিক তেমনি অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন না মনে করাও বাতুলতার নামান্তর। কাজেই তোমরা তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সংশোধন করে নাও। ঈমানের ক্ষেত্রে ব্যহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের সমন্বয় সাধন কর। অন্তরে এক আর বাইরে আরেক অবস্থা পরিহার কর।

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ[৯]

(তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। আপনি বলুন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করবে না; বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালনা করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।)

শানে নুযূল

এক. ইমাম ইবনুল মুনযির, তাবারানী এবং মারদুওয়াই সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আরবের কিছু সংখ্যক লোক রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুসলমান হয়েছি। আমরা কখনো আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করিনি। অথচ

---

[৮] সূরাহ্ আল-আন'য়াম: ৫৯।

[৯] *তাফসীরুল মুনীর*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬০৩; *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, অনুবাদ: (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন), ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪২৩; *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

অমুক গোত্র প্রকাশ্যে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১০]

দুই. ইমাম নাসাঈ, আল-বাযযার ও ইবনু মারদুওয়াই হযরত ইবন 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার আসাদ গোত্র রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আরবের অন্যান্য গোত্র আপনার সাথে যুদ্ধ করেছে অথচ আমরা আপনার সাথে কোন প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১১]

তিন. ইবন সা'দ মুহাম্মদ ইবন আল-কুরাযী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবম হিজরীর প্রথম দিকে আসাদ গোত্রের দশ জন লোক রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে হাদরামী ইবন 'আমির, দিরার ইবনুল আযূর, ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ, কাতাদা ইবনুল কাতিফ, সালামাহ ইবন হুবাইস, নাকাদাহ ইবন 'আব্দিল্লাহ, তালহা ইবন খুয়াইলিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় রাসূল (সা.) স্বীয় সাহাবীসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তারা সালাম জানালো এবং তাদের মধ্য থেকে একজন বক্তা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিজেরাই আপনার নিকট এসেছি। আপনি আমাদের কাছে কোন প্রতিনিধি পাঠাননি। আমরা আমাদের পেছনে থাকা লোকদের শুভেচ্ছা নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।[১২]

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের পর আরবের কিছু কিছু গোত্রের লোকেরা মনে করত যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলকে ধন্য করেছেন। তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে রাসূল (সা.) সম্মানিত হতেন না। এ আয়াতে তাদের প্রসূত এ ধারণাকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ ইসলাম তার স্বজ্যোতিতে দেদীপ্যমান। কেউ যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবূল না করে অথবা ইসলাম থেকে ফিরে যায় তাতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না; বরং যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা নিজেরাই ইসলামের জন্য ধন্য হয়েছে। আর আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন ও অসৎ, অকল্যাণ থেকে

---

১০ *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭।

১১ *সুনানু নাসাঈ আল-কুবরা*, ৬ষ্ঠ, পৃ. ৪৬৭।

১২ *আদ-দুররুল মানছূর*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২৭।

তাদেরকে দূরে রেখেছেন। এজন্য রাসূল (সা.) হুনাইন যুদ্ধের দিনে মদীনার আনসারদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

يامعشر الأنصار الم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى وكنتم متفرقين فألفكم الله بى وكنتم عالة فأغناكم الله بى قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل[১৩]

(হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথহারা পাইনি? আর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হিদায়াতদান করেছেন। তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা প্রতিস্থাপন করেছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রাচুর্যতা দান করেন নি? তারা বলল, হ্যাঁ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক উত্তম ও অনুগ্রহকারী।

বস্তুত: ঈমানী শক্তির বলেই কেবল একজন মানুষ প্রকৃত শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। তার কোন ভয় থাকবে না। সে সহসাই মনোবল হারিয়ে ফেলবে না, কারণ সে তো ঈমানী সম্পদে সমৃদ্ধশালী। তার কোন হারাবার ভয় নেই, তার নন্দিত গন্তব্য হলো আখিরাত। আর যে এ ঈমানী শক্তি থেকে বঞ্চিত সে পশুর মত আহার ভক্ষণ করুক অথবা বিশাল সম্পদের মালিক হোক না কেন বস্তুত: তাকে এ সম্পদগুলো ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে হবে। সে সময় এগুলো তার কোন কাজে আসবে না। এ ধরনের মানুষের চেয়ে পশু অধিকতর সুপথগামী। কারণ পশু জন্মগতভাবে আনুগত্যশীল এবং তারা আল্লাহর মৌলিক বিধানের প্রতি আস্থাশীল।[১৪]

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(নিশ্চয় আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্য বিষয় জানেন। আর তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ তা দেখছেন।)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আকাশ ও পৃথিবীর সকল অদৃশ্য বিষয় জানেন। অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতশীল হওয়া একমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া আর কেউই গায়িব জানেন না। তিনি মানুষের হৃদয় জগতে লুকিয়ে রাখা তথ্যও জানেন এবং তাদের কাজের খবরও রাখেন। সুতরাং আল্লাহ্কে বান্দাদের সম্পর্কে খবর জানার জন্য তাদের কথাবার্তার উপর নির্ভর করতে হয় না। তিনি তাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন

---

[১৩] *তাফসীরুল মুনীর*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬০২।

[১৪] *ফী যিলালিল কুরআন*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫৪।

বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।[১৫] যেমন, আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ তিনি চোখের লুকোচুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় জানেন। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْض وَلاَ فِي السَّمَاء 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ নিকট গোপনীয় নয়'

শর'ঈ আহকাম

১. ঈমানের অর্থ

আরবী ভাষায় إيمان শব্দটি أمن শব্দমূল থেকে উৎসারিত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, বিশ্বাস করা, নিরাপদ রাখা ইত্যাদি।[১৬] আর ইসলামী শরী'য়াতের পরিভাষায়- নবী করীম (সা.) আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করাকে *ঈমান* বলা হয়।[১৭] ঈমানের পারিভাষিক সংজ্ঞা দানে ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদদের চারটি মত বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা নিম্নরূপঃ

এক. একদল ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করেন যে, ঈমান হলো, অন্তরের বিশ্বাসের নাম। এ মতের প্রবক্তা হলেন, ইমাম আবূল হাসান আল-আশ'আরী, কাযী 'আব্দুল জাব্বার, উস্তাদ আবূ ইসহাক আল-ইস্ফেরাইনী ও আল-হুসাইন ইবনুল ফাদল প্রমুখ। তাঁরা মনে করেন যে, রাসূল (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা শুধু অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।[১৮] অপর একদল 'আলিম মনে করেন যে, শুধু অন্তর দ্বারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করাকেই ঈমান বলা হয়। এ ক্ষেত্রে মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের কোন রোকন ও শর্ত নয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে অন্তর দ্বারা চিনে অতঃপর মুখ দ্বারা অস্বীকার করে এবং তা স্বীকার করার পূর্বে মারা যায় তথাপিও তাকে বিশ্বাসী বলা যাবে। এটি জাহাম ইবন সাফওয়ানের মত। মুহাদ্দিসগণ জাহাম ইবন সাফওয়ানের এমতকে অস্বীকার করেন এবং এটিকে সত্য থেকে অনেক দূরে মনে করেন। কেননা এটি হাদীসের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[১৯]

দুই. আরেক দল 'আলিমের মতে, *ঈমান* হলো মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম। এ শ্রেণীর 'আলিম আবার দু'দলে বিভক্ত। তাদের একদলের মতে, যদিও মৌখিক

---

[১৫] সূরাহ্ গাফিরঃ ১৯।

[১৬] *লিসানুল 'আরাব*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১।

[১৭] কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাবী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল*, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ২৫।

[১৮] আল-'আইনী, '*উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড (কোয়েটাঃ মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ, তাবি), পৃ. ১০২।

[১৯] *প্রাগুক্ত*।

স্বীকারোক্তিকে *ঈমান* হিসেবে গণ্য করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে *ঈমান* হাসিল হওয়ার জন্য অন্তরের বিশ্বাস অপরিহার্য। আর অন্তরের বিশ্বাসকে *ঈমান* হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। কেননা এটি ঈমানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এমতের ধারক হলেন, গায়লান ইবন মুসলিম আদ দিমাস্কী এবং আল-ফাদল আর রুকাশী।[২০] অপর দল মনে করেন যে শুধু الاقرار با للسان কে ঈমান বলা হয়। এটি কারামিয়াদেরও মত। তারা ধারণা করেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুনাফিকও মু'মিন। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে তারা কাফির। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের উপর মুমিনের হুকুম বর্তাবে আর আখিরাতে তাদের উপর কাফিরের হুকুম প্রযোজ্য হবে।[২১]

তিন. তৃতীয় দল 'আলিমগণের মতে, *ঈমান* হলো অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম। এটি ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং সাধারণ ফকীহ ও মুতাকাল্লিমগণের মাযহাব। ইমাম আবূল হাসান আল-আশ'য়ারী এবং বিশর আল-মুরায়ছী প্রমুখ 'আলিমগণের মতে, অন্তর দ্বারা বিশ্বাস ও একসঙ্গে মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের খুলুসিয়াতকে *ঈমান* বলা হয়। *ঈমান* সম্পর্কিত 'আলিমগণের প্রদত্ত সংজ্ঞায় কোন বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও اقرار باللسان ঈমানের রুকন কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন 'আলিমগণের মতে اقرار باللسان তথা মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের শর্তভুক্ত। এজন্যই যদি কোন ব্যক্তি রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে তাহলেই তাকে মু'মিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। যদিও সে তা মৌখিকভাবে اقرار না করে। ঈমাম হাফিয উদ্দীন, ইমাম আবূল হাসান আল-আশ'য়ারী ও ইমাম আবূ মনসূর আল-মাতুরিদীর মত হিসেবে উল্লেখ করেন। অপরদিকে কতিপয় 'আলিম মনে করেন যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি ঈমানের রুকন হলেও তা ঈমানের আসল বস্তু নয়। তারা মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঈমানের বর্ধিত রোকন হিসেবে উল্লেখ করেন।[২২]

চার. কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে, ঈমান হলো এক সঙ্গে অন্তর ও মুখের কাজ, যা শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ এবং আওযাঈসহ অনেক 'আলিম এ মতের প্রবক্তা। তাদের মতে, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং কার্যক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন এ তিনটির সম্মিলিত রূপকে ঈমান বলা হয়।

---

[২০] *প্রাগুক্ত*।

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩-১০৪।

হাদীসের আলোকে ঈমানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঈমান হলো নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম। যেমন, হযরত জিব্রাইল (আ.) রাসূল (সা.)কে ঈমান কী? তা জানতে চাইলে রাসূল (সা.) এর জবাবে বলেছিলেন, ঈমান হলো- আল্লাহর প্রতি, তদীয় ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত ও তাকদীরের ভালমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।[২৩] ঈমান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে রাসূলের এ জবাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত জিব্রাইল (আ.) সম্ভবতঃ রাসূলের নিকট ঈমানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। এ জন্য রাসূল (সা.) কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর এ জবাব ছিল ঈমানের আনুসাঙ্গিক বিষয় সম্পর্কিত, ঈমানের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে নয়।

২. ইসলামের অর্থ

ইসলাম শব্দটি سلم শব্দ থেকে এসেছে এর অর্থ হলো- শান্তি, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি।[২৪] আর পরিভাষায়-

الاسلام هو الخضوع والانقياد لما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم[২৫]

'রাসূল (সা.) যে জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছেন তা বিনয়াবনত হয়ে মেনে নেয়াকে ইসলাম বলা হয়।'

হাদীসের আলোকে ইসলামের সংজ্ঞা হলো, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ এক তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং শক্তি সামর্থবান হলে আল্লাহর ঘরে হজ্জ পালন করা।'[২৬]

শরী'য়াতের পরিভাষায় ইসলামের যেসব সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম ঈমান থেকে নিম্ন।[২৭] আর সেটি হলো মৌখিক

---

[২৩] فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
দ্র: *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-১, পৃ. ২৪।

[২৪] *লিসানুল 'আরাব*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

[২৫] *আল-কামূসুল ফিক্হী*, পৃ. ১৮১।

[২৬] اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا দ্রষ্টব্য: *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং- ১, পৃ. ২৪।

[২৭] *আল-কামূসুল ফিকহী*, পৃ. ১৮১।

স্বীকারোক্তি যার দ্বারাজান মাল নিরাপত্তা লাভ করে এবং এর সাথে ই'তিকাদ তথা বিশ্বাসও অর্জিত হয়। আবার কখনো অর্জিত হয় না। এ অর্থই নিম্নোক্ত আয়াতে প্রতিভাত হয়েছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ[২৮]

'মরুচারী লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরসমূহে প্রবেশ করেনি।'

আবার কখনো ইসলাম ঈমান থেকে উচ্চ বিষয় হিসেবে গণ্য হয়।[২৯] আর সেটি হলো, অন্তর প্রসূত বিশ্বাসকে মৌখিকভাবে স্বীকার করা এবং প্রকাশ্যে তা কার্যে পরিণত করা। আল্লাহ বান্দার জন্য যা ফয়সালা করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন সেগুলোর প্রতি আত্মসমর্থন করা ও মেনে নেয়াকে ইসলাম বলে। এটিকে শরী'য়াতের পরিভাষায় استسلام শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।[৩০] এ অর্থই নিম্নোক্ত আয়াতে পরিব্যক্ত হয়েছে,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ[৩১]

'যখন তাকে তার রব্ব বললেন, অনুগত হও। সে বলল আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।'

মোট কথা, রাসূল (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবন পরিচালনার জন্য যে বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন তা অন্তরে বিশ্বাস করে মৌখিক স্বীকার করতঃ ব্যবহারিক জীবনে কার্যে পরিণত করার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়ার নাম *ঈমান*। আর অন্তরের এ বিশ্বাসকে মুখে স্বীকার করতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনে তা বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠাকরণকে *ইসলাম* বলা হয়। একে আল-কুরআনের ভাষায় একমাত্র দ্বীন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ[৩২]

---

[২৮] সূরাহ্ আল-হুজুরাতঃ ১৪।

[২৯] *আল-কামূসুল ফিকহী*, পৃ. ১৮১।

[৩০] *প্রাগুক্ত*।

[৩১] সূরাহ্ আল-বাকারাহঃ ১৩১।

[৩২] সূরাহ্ আলে 'ইমরানঃ ১৯।

'ইসলাম হলো, আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান।'
আর এ জীবন বিধান হলো আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত শেষ বিধান। এর পরে দ্বিতীয় কোন শরী'য়াত বা জীবন বিধান আর প্রবর্তিত হবে না। যেমন, আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا[৩৩]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দিন হিসেবে মনোনীত করলাম।'

৩. ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী শরী'য়াতের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়। আর ব্যাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়।[৩৪] কিন্তু শরী'য়াতের দৃষ্টিতে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো, মুখে কালেমার স্বীকৃতি দান। এমনিভাবে ইসলাম ব্যহ্যিক কাজকর্মের নাম হলেও শরী'য়াতে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ না অন্তরে বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। সুতরাং শব্দগত দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য হলেও মর্মগত দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এজন্য ইমাম বুখারীর (রহ.) দৃষ্টিতে ঈমান ও ইসলাম এক এবং অভিন্ন।[৩৫] এ সূত্রে প্রত্যেক মু'মিন হলো মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিমই হলো মু'মিন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবন হাজার আল-'আসকালানী এ প্রসঙ্গে বলেন,

انهما كالفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا[৩৬]

'এ শব্দ দু'টি ফকীর ও মিসকীন শব্দের মত। এ দুটি শব্দ একস্থানে ব্যবহৃত হলে পৃথক পৃথক অর্থ দিবে আবার পৃথক পৃথক স্থানে ব্যবহৃত হলে একই অর্থ দিবে।'
সুতরাং ঈমান ও ইসলাম শব্দ দু'টি কোন কোন ক্ষেত্রে সমার্থবোধক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অসমার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুরআন ও সুন্নাহ্য় শব্দ দু'টির এরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

---

[৩৩] সূরাহ্ আল-মায়িদাহ: ৩।

[৩৪] '*উমদাতুল কারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*।

[৩৬] মাওলানা আবুল হাসান, *তানযীমুল আসতাত*, ১ম জুয (করাচী: দারুল ইশা'আত, তাবি) পৃ. ২৯।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. ইবনু মানযূর আল-আফরীকী, *লিসানুল 'আরাব*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তাবি।
৩. লুইস মা'লূফ, *আল-মুনজিদ*, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রী.।
৪. প্রফেসর ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আত-তাফসীরুল মুনীর ফীল 'আকীদাহ ওয়াশ শরী'আহ্*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৪১৮ হি./ ১৯৯৮ খ্রী.।
৫. আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০২ খ্রী.।
৬. আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছূর*, কায়রো: মাকতাবাতুর রিহাব, ২০০৭ খ্রী.।
৭. আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি।
৮. ইমাম বুখারী, *আল-জামি'উস সহীহ*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী.।
৯. আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান* ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত: দারু ইহ্‌ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ২০০১ খ্রী.।
১০. আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০২ খ্রী.।
১১. আল-খাযিন, *লুবাবুত তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০২ খ্রী.।
১২. আল-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্‌, ২০০৭ খ্রী.।
১৩. আবুল লাইছ, আল-সমরকন্দী, *বাহরুল 'উলূম*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩হি./১৯৯৩ খ্রী.।
১৪. আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হিসান*, বৈরূত: দারু ইহ্‌ইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৯৭ খ্রী.।
১৫. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২ খ্রী.।
১৬. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৯৯১ খ্রী.।
১৭. আল-বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি।
১৮. ইবনু আবী শায়বাহ্‌, *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি।
১৯. সাইয়েদ আবুল আলা মুওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী.।
২০. ইমাম আবূ সউদ, *ইরশাদু 'আকলিস সালীম ইলা-মাযায়াল কুরআনিল কারীম*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০১ খ্রী.।

২১. আবূ বকর ইবনুল আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, তাহকীক: মুহাম্মদ 'আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি ।
২২. সাইয়েদ কুত্ব, *ফী যিলালিল কুরআন*, বৈরূত: দারুশ শুরুক, তাবি ।
২৩. হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর, *তাফসীরু কুরআনিল আযীম*, কায়রো: মুয়াসসাসাতুল মুখতার, ২০০২ খ্রী. ।
২৪. ইবনু 'আতিয়্যাহ আল-গারনাতী, *আল-মুহাররারুল ওয়াজীয*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি ।
২৫. আল-কাসিমী, *মাহাসিনুত তা'বীল*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রী. ।
২৬. আল-হাকেম, *আল-মুসতাদরাক*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি/১৯৯৮ খ্রী. ।
২৭. আহমদ মুস্তাফা আর-মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি/১৯৯৮ খ্রী. ।
২৮. ফাখরুদ্দীন আল-রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি/১৯৯৫ খ্রী. ।
২৯. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রী. ।
৩০. আস-সাখাভী, *ফাতহুল মাজীদ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩ হি/১৯৯৩ খ্রী. ।
৩১. আয-যামামখারী, *আল-কাশশাফ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি ।
৩২. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *আত-তাফসীরুল মাযহারী*, দীওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো তাবি ।
৩৩. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী. ।
৩৪. মুহাম্মদ 'আলী সায়েস, *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রী. ।
৩৫. আবূ ইয়া'লা, *আস-সুনান*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রী. ।
৩৬. আল-হায়ছামী, *মাজমাউয যাওয়িদ*, বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, ২০০২ খ্রী. ।
৩৭. আস-সুয়ূতী, *আল-'ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রী. ।
৩৮. আল-হাইছামী, *মাওয়ারিদ আল-জুমান*, বৈরূত: দারুল জীল, তাবি ।
৩৯. ইমাম তাহাবী, আল-'আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ্, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্, ২০০১ খ্রী. ।
৪০. আল জাযায়িরী, *মিনহাজুল মুসলিম*, কায়রো: দারু ইবনিল হায়ছাম, ২০০২ খ্রী. ।
৪১. আল-আইজী, *কিতাবুল মাওয়াকিফ*, ঢাকা: সৌদিয়া কুতুব খানা, তাবি ।

৪২. আবূ বকর আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রী. ।

৪৩. কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাবী, *তাফসীরুল বায়দাবী*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, তাবি ।

৪৪. ইমাম সুয়ূতী, *ফী আসবাবিন নুযূল*, কায়রো: দারুত তাকওয়া তাবি ।

৪৫. ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূ'মিল ইসলামিয়্যাহ, তাবি ।

৪৬. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, পাকিস্তান: আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়্যাহ, তাবি ।

৪৭. সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূস আল-ফিকহী*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, তাবি ।

৪৮. আল-কুরতুবী, *আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০২ খ্রী. ।

৪৯. আল-আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, তাবি ।

৫০. আল-সুরুখসী, *আল-মাবসূত*, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ১৯৯৩ খ্রী. ।

৫১. আল কারদারী, *মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফাহ*, পাকিস্তান: কোয়েটা, তাবি ।

৫২. *আল-ইনসাফ*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রী. ।

৫৩. ইমাম আল-গাযালী, *ইহ্ইয়াউ উলূমিদ দ্বীন*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, তাবি ।

৫৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান আল-মাগরিবী, *জাম'উল ফাওয়ায়িদ*, বৈরুত: দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৮ খ্রী. ।

৫৫. ইমাম নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, দিল্লী: আসাহুল মাতাবি' তাবি ।

৫৬. ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব আল-তিবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ্, তাবি ।

৫৭. আহমাদ মোল্লা জীউন, *আত-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ*, পেশাওয়ার মাকতাবায়ে হক্কানিয়্যাহ্ তাবি ।

৫৮. মুহাম্মদ সাইয়েদ তানতাবী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত*, কায়রো: দারুস সা'আদাহ্, তাবি ।

৫৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী', *আহকামুল কুরআন*, করাচী: ইদারাতুল কুরাআন, তাবি ।

৬০. মাওলানা আবুল হাসান, *তানযীমুল আসতাত*, করাচী: দারুল ইশা'আত, তাবি ।

৬১. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি ।

৬২. আবূ বকর জাবির আল-জাযায়িরী, *আইসারুত তাফসীর*, আল-মদীনা মুনাওওয়ারাহ্: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২০০৩ খ্রী. ।

৬৩. ইবনু আবী শায়বাহ্, *আস-সুনান*, বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্, তাবি ।

৬৪. আল-বায্যার, *আল-মুসনাদ*, তাহ্কীক: হাবীবুর রহমান আল-আযমী, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্, তাবি ।
৬৫. শানকীতী, *আদওয়াউল বায়ান*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রী. ।
৬৬. ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *আত-তামহীদ*, তাহ্কীক: সা'ঈদ আহমাদ আ'রাব, মুয়াসসাসাতু কুরতবা, তাবি ।
৬৭. বদরুদ্দীন আল-'আইনী, *'উমদাতুল কারী*, কোয়েটা: মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ, তাবি ।
৬৮. ফকীহ্ আবুল লাইছ আস-সামারকান্দী, *তাবীহুল গাফিলীন*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৫খ্রী. ।
৬৯. মুহাম্মদ ইযযাহ্ দারওয়াযাহ্, আত-*তাফসীরুল হাদীস*, কায়রো: দারুল মাগরিব, তাবি ।
৭০. মাহমূদ ইবন হামযাহ্ আল-কিরমানী, *গারাইবুত তাফসীর*, সৌদী আরব: মুওয়াস্‌সাসাতুল কিবলাহ্, ১৯৮৮ খ্রী. ।
৭১. খতীব আল-বাগাদাদী, *আল-কিফায়াহ্ ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তাবি ।
৭২. ইবনু 'আব্দিল বারর, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদলুহু*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তাবি ।
৭৩. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মুজামুল বুলদান*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তাবি ।
৭৪. আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়াহ্*,কায়রো: দারুস সালাম, ২০০৬ খ্রী. ।
৭৫. ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র ১৯৯৬ খ্রী. ।
৭৬. 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, হায়দারাবাদ: প্রকাশনা নামবিহীন ।
৭৭. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-ইনসাফ*, কায়রো: মাতবায়াতুস সুন্নাহ্ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ্, তাবি ।
৭৮. আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, *আখবারু ইস্পাহান*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, তাবি ।
৭৯. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, তাবি ।
৮০. আত-তহাবী, *মুশকিলুল আছার*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তাবি ।
৮১. আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, পাকিস্তান: ইদারাতুল কুরআন, তাবি ।
৮২. আত-তহাবী, *শারহু মা'আনিল আছার*, বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, তাবি ।
৮৩. আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম*, কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ্, ১৯৯২খ্রী. ।
৮৪. নাসাঈ, *আস-সুনান*, কায়রো: দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী. ।
৮৫. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, কায়রো: মাতবা'য়াতু যাহিদ আল-কুদসী, তাবি ।

৬৪. আল-বায্যার, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক: হাবীবুর রহমান আল-আযমী, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্, তাবি ।
৬৫. শানকীতী, *আদওয়াউল বায়ান*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৬ খ্রী. ।
৬৬. ইবনু 'আবদিল বার্র, *আত-তামহীদ*, তাহকীক: সা'ঈদ আহমাদ আ'রাব, মুয়াসসাসাতু কুরতবা, তাবি ।
৬৭. বদরুদ্দীন আল-'আইনী, *'উমদাতুল কারী*, কোয়েটা: মাকতাবায়ে রশীদিয়্যাহ, তাবি ।
৬৮. ফকীহ্ আবুল লাইছ আস-সামারকান্দী, *তাবীহুল গাফিলীন*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৫খ্রী. ।
৬৯. মুহাম্মদ ইযযাহ্ দারওয়াযাহ্, আত-*তাফসীরুল হাদীস*, কায়রো: দারুল মাগরিব, তাবি ।
৭০. মাহমূদ ইবন হামযাহ্ আল-কিরমানী, *গারাইবুত তাফসীর*, সৌদী আরব: মুওয়াস্সাসাতুল কিবলাহ্, ১৯৮৮ খ্রী. ।
৭১. খতীব আল-বাগাদাদী, *আল-কিফায়াহ্ ফী 'ইলমির রিওয়ায়াহ*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি ।
৭২. ইবনু 'আব্দিল বারর, *জামি'উ বায়ানিল 'ইলম ওয়া ফাদলুহু*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি ।
৭৩. ইয়াকূত আল-হামাবী, *মু'জামুল বুলদান*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি ।
৭৪. আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়াহ্*,কায়রো: দারুস সালাম, ২০০৬ খ্রী. ।
৭৫. ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, বৈরূত: দারুল ফিক্র ১৯৯৬ খ্রী. ।
৭৬. 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, হায়দারাবাদ: প্রকাশনা নামবিহীন ।
৭৭. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-ইনসাফ*, কায়রো: মাতবায়াতুস সুন্নাহ্ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ্, তাবি ।
৭৮. আবূ না'ঈম আল-ইস্পাহানী, *আখবারু ইস্পাহান*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ্, তাবি ।
৭৯. খতীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, তাবি ।
৮০. আত-তহাবী, *মুশকিলুল আছার*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি ।
৮১. আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, পাকিস্তান: ইদারাতুল কুরআন, তাবি ।
৮২. আত-তহাবী, *শারহু মা'আনিল আছার*, বৈরূত: দারুল ফিক্র, তাবি ।
৮৩. আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম*, কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ্, ১৯৯২খ্রী. ।
৮৪. নাসাঈ, *আস-সুনান*, কায়রো: দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রী. ।
৮৫. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম*, কায়রো: মাতবা'য়াতু যাহিদ আল-কুদসী, তাবি ।

৮৬. আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি ।
৮৭. ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত তাফসীর*, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৯৪ খ্রী. ।
৮৮. মুহাম্মাদ 'আলী সায়িস, *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, দামিস্ক: দারু ইবনি কাছীর, ২০০৭খ্রী. ।
৮৯. আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *ফয়যুল কাদীর*, মিসর: মাকতাবাতু তিজারিয়্যাহ্, তাবি ।
৯০. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, *জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম*, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ্, ১৪০৮ হি. ।
৯১. আশ-শওকানী, *নায়লুল আওতার*, বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৭৩খ্রী. ।
৯২. ইমাম নববী, *কিতাবুল আযকার*, জেদ্দা: কিন্দা লিল 'ইলাম ওয়ান নাশ্‌র, তাবি ।
৯৩. 'আল্লামা 'আব্দুল হাই লাখনবী, *গীবত*, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী. ।
৯৪. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রী. ।
৯৫. ইমাম আল-গাযালী, *ইহ্‌ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, অনুবাদ: এম.এন.এম. ইমদাদুল্লাহ্, ঢাকা: তাজ কোম্পানী, ২০০৮ ।
৯৬. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের ধারণা*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো বাংলাবাজার, ২০০৪ খ্রী. ।
৯৭. ফকীহ্ আবূল লাইছ আস-সামারকান্দী, *তাম্বীহুল গাফেলীন*, অনুবাদ: মওলানা লুৎফর রহমান, ঢাকা: মিনা বুক হাউস ।
৯৮. সাইয়্যেদ কুতুব, *ফি যিলালিল কুরআন*, বাংলা অনুবাদ, লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী, ২০০১ ।
৯৯. মুহাম্মদ হাশিম কামালী, *ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা*, অনু: মো: সাজ্জাদুল ইসলাম, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৯ ।
১০০. মো: শাদী শরীফ, *সূরাতুল হুজুরাতে বর্ণিত সামাজিক বিধান ও আদর্শ সমাজ গঠনে তার ভূমিকা*, এম. এ. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খ্রী. ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

০১ ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, *এম. উমর চাপরা, ২০০২, ২৫০/-*

০২ ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, *এম. উমর চাপরা, অনুবাদ: ড. মাহমুদ আহমেদ, ২০০২, ১৬০/-*

০৩ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে : অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ, *এম. উমর চাপরা অনুবাদ: ড. মাহমুদ আহমেদ, ২০১১, ৩০০/-*

০৪ ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা -সামাজিক প্রেক্ষাপট, *এম. রুহুল আমিন অনূদিত, ২০০৩, ১৩০/-*

০৫ ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ, *এম আকরাম খান / এম রকিবুজ জামান, ২০০৫, ৭০/-*

০৬ ইসলামী জীবন বীমা ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত, *কাজী মোরতুজা আলী, ২০০৬, ১৭৫/-*

০৭ উন্নয়ন ও ইসলাম, *প্রফেসর খুরশিদ আহমদ, ২০০৭, ৩৫/-*

০৮ ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, *ড. মাহমুদ আহমদ, ২০১০, ৬০/-*

০৯ Guidelines to Islamic Economics : Nature, Concept and Principles, *Prof. M. Raihan Sharif, 1996, 350/-*

১০ Accounting Philosophy Ethics and Principles : The Islamic Perspective, *M. Zohurul Islam, 2000, 200/-*

১১ Al-Zakah : A Hand book of Zakah Administration, *M. Zohurul Islam FCA, 1999, 200/-*

১২ On Openness, Integration and Economic Growth, *Dr. M. Kabir Hasan, 2003, 200/-*

১৩ A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries, *Dr. Masudul Alam Chowdhury, 2003, 350/-*

১৪ Globalization and the Muslim World, *M. Kabir Hassan, Ph.D., 2003, 500/-*

১৫ Islamic Management : Islamic Perspective, *Prof. Dr. Md. Luqman (Ed), 2007, 200/-*

১৬ An Analysis of the Development of Socio-Economic Development, *M. Zohurul Islam FCA, 2007, 100/-*

খ. সামাজিক বিজ্ঞান

০১ ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ, *ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান, অনুবাদ : মাও: আকরম ফারুক, ২০০১, ৬০/-*

০২ রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খন্ড), *ড. আকরাম জিয়া আল উমরী, অনুবাদ: মো: সাজ্জাদুল ইসলাম, ১৯৯৮, ১৫০/-*

০৩ রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খন্ড), *ড. আকরাম জিয়া আল উমরী, অনুবাদ: এম. রুহুল আমিন, ২০০৭, ১৭০/-*

০৪ আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ, *অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার (সম্পাদনা), ২০০১, ৬০/-*

০৫ ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, *ড. আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান, অনুবাদ: অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার, ২০০২, ২৫০/-*

০৬ প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিত, *ড. মুহাম্মদ আল বুরে, ২০০৭, ৩০০/-*

০৭ গণতন্ত্র ও ইসলাম, *অনুবাদ: এম. রুহুল আমিন, ২০০৫, ১২০/-*

০৮ সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম, *অনুবাদ: এম. রুহুল আমিন, ২০০৫, ১০০/-*

০৯ লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা, *প্রফেসর আবদুন নুর, ২০০৬, ২৬০/-*

১০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত, *আবদুর রশিদ মোতেন*, ২০০৭, ২০০/-

১১ শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামী প্রেক্ষিত, ড. *জাফর ইকবাল*, ২০০৮, ১৫০/-

১২ জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ : উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম, *তাহির আমিন*, ২০০৮, ১০০/-

১৩ ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, *মোহাম্মদ হাশিম কামালি*, ২০০৯, ২৫০/-

১৪ বৈবাহিক সমস্যা ও কোরআনের সমাধান, *আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান ও প্রফেসর ড. জেফরি লাং*, ২০১০, ৩০/-

১৫ সুবহে সাদিক : আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা, *আল্লামা খুররম জাহ্ মুরাদ*, ডিসেম্বর ২০১০, ১২০/-

১৬ ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ : ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা, ড. *মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি*, ১৯৯৮, ১২০/-

১৭ Civilization and Society, *Dr. Syed Sajjad Husain, 1994, 300/-*

১৮ A Young Muslim's Guide to Religions in the World, *Dr. Syed Sajjad Husain, 1992, 250/-*

১৯ The Islamic Theory of Jihad and International System, *Md. Moniruzzaman, 1999, 200/-*

২০ Leadership: Western and Islamic, *Dr. M. Anisuzzaman & Prof. Zainul Abedin Majumder, 1996, 70/-*

২১ Social Laws of Islam, *Shah Abdul Hannan, 1995, 40/-*

২২ Islamization of Academic Discipline, *M. Zohurul Islam FCA (Editor), 1997, 150/-*

ঘ. ইতিহাস - ঐতিহ্য

০১ মুসলিম মানসে সংকট, ড. *আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*, অনুবাদ : *মোঃ মাহবুবুল হক*, ২০০৬, ১৫০/-

০২ মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট, ড. *আব্দুলহামীদ আহমাদ আবুসুলায়মান*, অনুবাদ : *মোঃ মাহবুবুল হক*, ২০০৯, ২২৫/-

০৩ মুসলিমের ইউরোপ, *তারিক রমাদান*, ২০০৮, ১৫০/-

ঙ. বিজ্ঞান ও সভ্যতা

০১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন, *এম এ কে লোদী সম্পাদীত*, অনুবাদ : *মোঃ খায়রুল আলম*, ২০০৮, ১৫০/-

০২ Origin and Development of Experimental Science, Dr. Muin-Ud-din Ahmad Khan, 120/-

০৩ Man and Universe, Major Md. Zakaria Kamal, 200/-

০৪ Medical Education : Islamic Perspective, Prof. Dr. Omer Hasan Kasuli, 200/-

০৫ Medical Ethics, Prof. Dr. Omer Hasan Kasuli, 50/-

০৬ মেডিকেল এথিক্স : ইসলামি দৃষ্টিকোণ, *প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলী*, ২০১০, ৬০/-

চ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

০১ অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা, *মালিক বদরী*, ২০০৯, ৫০/-

০২ নির্মাতাদের দ্বীপ, *আব্দুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান*, ২০০৯, ১২০/-

০৩ নির্মাতাদের দ্বীপের গুপ্তধন, *আব্দুলহামীদ আহমদ আবুসুলায়মান*, ২০০৯, ১২৫/-

০৪ লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড, *আইআইআইটি স্টাইলশীট*, ২০০৯, ৫০/-

০৫ Islam in Bengali Verse, Poet Farruk Ahmed, *Translated: Dr. Syed Sajjad Husain, 1992, 100/-*

ছ. নারী বিষয়ক

০১ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, *বি. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন, অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, ১৯৯৬, ৫০/-*

০২ রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খন্ড), *আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব, ২৫০/-*

০৩ রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খন্ড), *আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব, ২০০২, ২৫০/-*

০৪ রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (৩য় খন্ড), *আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব, ২০০/-*

০৫ রাসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (৪র্থ খন্ড), *আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, অনুবাদ : আব্দুল মান্নান তালিব, ২০০৬, ২৫০/-*

০৬ মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক, *জামাল আল বাদাবি, অনুবাদ : মোঃ শামীম আহসান, ১৯৯৭, ২৫/-*

জ. ধর্মতত্ত্ব

০১ ইসলামী উসূলে ফিকাহ, *তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী, অনুবাদ : মুহাম্মদ নূরুল আমিন জাওহার, ১৯৯৬, ৭০/-*

০২ আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য, *ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, অনুবাদ : অধ্যাপক শাহেদ আলী, ১৯৯৮, ১৭৫/-*

০৩ কোরআন ও সুন্নাহ : স্থান - কাল - প্রেক্ষিত, *তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী, ১৯৯৭, ৫০/-*

০৪ তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক, *প্রফেসর ড. রশীদ আহমদ. জালন্ধরী, অনুবাদ : ড. আবদুল ওয়াহীদ অনূদিত, ২০০৪, ১০০/-*

০৫ জ্ঞানের ইসলামায়ন, *ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলায়মান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন, ২০০৭, ৩০/-*

০৬ ইসলামের দন্ডবিধি, *ড. আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসোলায়মান, অনুবাদ : এম রুহুল আমিন, ২০০৭, ২০/-*

০৭ জ্ঞান ইসলামীকরণ: স্বরূপ ও প্রয়োগ, *প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, ২০০৯, ৩০/-*

০৮ ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট, *প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, ২০০৩, ২০০/-*

০৯ ইসলামী শিক্ষা সিরিজ (একত্রে ৩খন্ড), *ড. জামাল আল বাদাবী, ২০০৬, ৩০০/-*

১০ ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি, *তাহা জাবির আল্ আলওয়ানী, ২০০৯, ১৪০/-*

১১ শিশুদের জন্য ৪০ হাদীস, *প্রফেসর ড. ইয়াসার কানদেমীর, অনুবাদ: মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, ২০১১*

১২ তাইসীরুল তাফসীর (সূরাহ্ আল-হুজরাত), *প্রফেসর ড. বেলাল হোসেন, ২০১১, ২৫০/-*

১৩ Shah Wali Allah`s concept of Ijtihad and Taqlid, *Professor Dr. Md. Athar Ali, 2001, 250/-*

১৪ Selections From Akram Khan's Tafsirul Qur'an, *Editorial Board, heded by Shah Abdul Hannan 2009, 175/-*

১৫ Islamic Revivalism, Prof. Muin-ud-Din Ahmad Khan, 2010, 250/-

১৬ Qur'anic and Hadith Studies Critical Reflection on Some Issues, *Israr Ahmad Khan, 2011, 230/-*

ঝ. Journal (Half yearly)

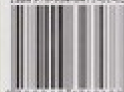
Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)

$ 30.00 Individual $ 50.00 Institution, Tk. 250/-

গ্রন্থকার পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন কচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর তিনি মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগসহ অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ১৯৯০ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৯১ সালে এম.এ. পরীক্ষায়ও রেকর্ড পরিমান নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কলা অনুষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দু'টি স্বর্ণপদক ও দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বৃত্তি লাভ করেন।

ড. হোসেন ১৯৯৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এ বিভাগে প্রফেসর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কিছুদিন কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে হাদীসের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁর প্রায় অর্ধশতাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত ও প্রকাশনাধীন গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে আরবি ভাষায় লিখিত তাফসীর সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ মিসরের কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাফসীর বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করে *পিএইচডি* ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া তিনি মিশরের বিশ্ববিখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উসূলুদ দ্বীন ফ্যাকাল্টিতে তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল *ইলমু মুকারানাতিল আদইয়ান: নাশআতুহু ওয়া তাতাওয়ারুহু ওয়া মুসাহামাতু 'উলামায়িল মুসলিমীন ফীহি*। বর্তমানে তিনি বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের সূরাহভিত্তিক তাফসীর ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত রয়েছেন।


ISBN 978-984-8471-01-02